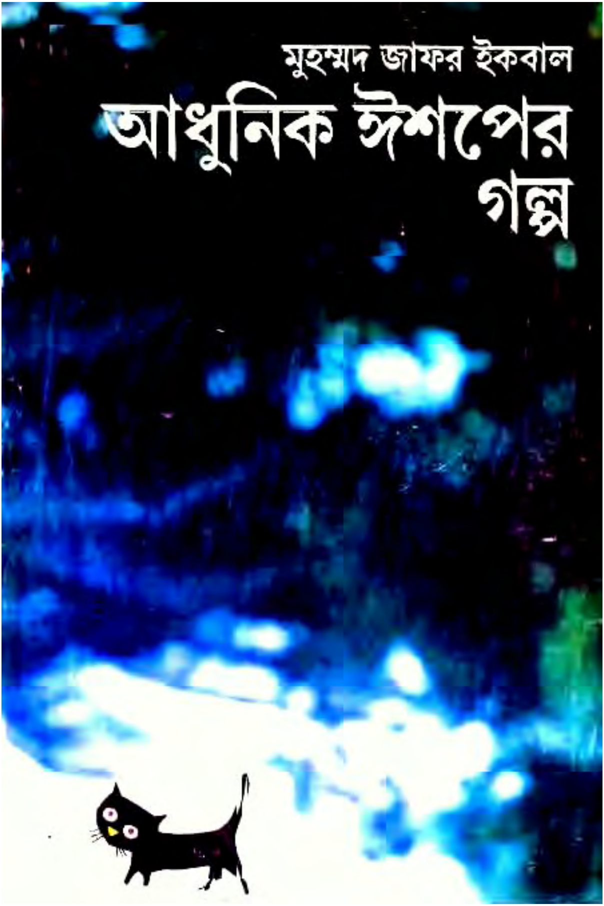
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
আধুনিক ঈশপের গল্প

ভূমিকা

এ দেশে, এ সময়ে যদি ঈশপের জন্ম হত তাহলে তার গল্পগুলি কেমন হত? ব্যাপারটা কারো জানার কথা নয়, তাই এখানে একটু কল্পনা করে দেখেছি, তার বেশী কিছু নয়।

মহামতি ঈশপ বেঁচে থাকলে আমার এই ধৃষ্টতাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করতেন।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
১৫ই জুলাই, ১৯৯৫
শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়
সিলেট

সূচীপত্র

১.খরগোস ও কাছিম.....................৭
২. শেয়াল ও আঙুর.....................৯
৩. তৃষ্ণার্ত কাক এবং পানির কলসী.১১
৪. বিড়ালের গলায় ঘন্টা...............১৩
৫. নদীতে বালক.........................১৬
৬. লেজ কাটা শেয়াল...................১৮
৭. সিংহের প্রেম...........................২১
৮. সিংহের সাম্রাজ্য......................২৪
৯. নেউল এবং মানুষ...................২৬
১০. দুই ব্যাঙ.............................২৮
১১. নেকড়ে বাঘ ও ভেড়া শাবক....৩০
১২. পিতা ও পুত্র........................৩২
১৩. সিংহ ও ইঁদুর.......................৩৫
১৪. চাঁদ ও তার মা.....................৩৭
১৫. শেয়াল এবং সিংহ.................৩৮
১৬. ঘাস ফড়িং ও পিপড়া.............৪০
১৭. খরগোস ও ব্যাঙ...................৪২
১৮. বুড়ো সিংহ...........................৪৪
১৯. বালক ও বাদামের বয়াম........৪৬
২০. কাক ও সাপ........................৪৮
২১. পিপড়া.................................৫০
২২. কাছিম এবং ঈগল পাখী..........৫১
২৩. গাধা এবং কুকুর...................৫৩
২৪. ষাড় এবং কশাই...................৫৪
২৫. বাড়ীর ছাদে ছাগল................৫৬
২৬. কুকুর এবং নেকড়ে বাঘ.........৫৮
২৭. সূর্য এবং ব্যাঙের অভিযোগ...৬০
২৮. পথচারী ও বট গাছ...........৬১
২৯. ঈগল ও তীর....................৬২
৩০. পিপড়া এবং ঘুঘু পাখী........৬৩
৩১. শেয়াল ও সারস...............৬৫
৩২. পশু পাখী এবং বাদুর..........৬৭
৩৩. দুই প্রেমিকা....................৬৯
৩৪. সিংহ এবং বুনো শূকর........৭০
৩৫. গাধা এবং তার ছায়া.......... ৭২
৩৬. কুকুর এবং তার প্রতিবিম্ব.....৭৫
৩৭. ব্যাঙ এবং কূয়া..................৭৬
৩৮. এক চক্ষু হরিণ..................৭৭
৩৯. শেয়াল এবং ছাগল............৭৮
৪০. জ্যোতির্বিদ.........................৮০
৪১. গাধা এবং সিংহের চামড়া....৮১
৪২. কৃপন ৮৩
৪৩. শেয়াল এবং কাকড়া..........৮৫
৪৪. চাষী এবং তার ছেলেরা.......৮৭
৪৫. জেলে এবং ছোট মাছ.........৮৯
৪৬. কৃষক ও সাপ....................৯০
৪৭. বাঘ ও সারস....................৯১
৪৮. ব্যাঙ ও বালকের দল...........৯৩
৪৯. রাখাল বালক ও বাঘ..........৯৪
৫০. হাঁসের সোনার ডিম...........৯৫
৫১. কাক ও শেয়াল.................৯৬

খরগোস ও কাছিম

সনাতন রূপ: কাছিম তার ধীরে ধীরে হাটা চলা নিয়ে খরগোসের ঠাট্টা সহ্য করতে না পেরে একদিন খরগোসকে দৌড় প্রতিযোগিতায় ডেকে বসল। যথা সময়ে দৌড় শুরু হয়েছে, খরগোস চোখের পলকে কাছিমকে পিছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেল। মাঝামাঝি পৌছে খরগোস দেখল তার হাতে অনেক সময়, সময় কাটানোর জন্যে সে তখন কিছু ঘাস লতা পাতা খেয়ে ঠিক করল গাছের ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নেবে। বসে থাকতে থাকতে তার চোখে হঠাৎ ঘুম নেমে এল। এদিকে কাছিম ধীর পায়ে হেঁটে হেঁটে খরগোসকে পার হয়ে একেবারে শেষ মাথায় পৌছে গেছে। হঠাৎ খরগোসের ঘুম ভাংল, দেখতে পেল কাছিম প্রায় শেষ মাথায় পৌছে গেছে। সে তখন প্রাণপনে দৌড়াতে শুরু করল, কিন্তু কোন লাভ হল না। কাছিম তার আগেই শেষ মাথায় পৌছে গেছে।

সুবচন: সুস্থির ও ধীর গতিরই জয় হয়।

আধুনিক রূপ: নিউমার্কেটে এক বইয়ের দোকানে খরগোস আর কাছিমের দেখা। খরগোস মুখ বাঁকা করে হেসে বলল, কিরে ব্যাটা কাছিম, তোর হাঁটা দেখে হেসে মরি। এক পা যেতে দেখি আধ ঘন্টা লেগে যায়!

কাছিম গম্ভীর হয়ে বলল, যার যে রকম দস্তুর। কিন্তু তাতে ক্ষতিটা কি হয়েছে? আজকাল তো আর আগের মত পায়ে হেঁটে যেতে হয় না। রিক্সা আছে, স্কুটার আছে, বাস আছে যেখানে যাবার কথা সেখানে সময় মত পৌছালেই হল।

খরগোস তার চোখ লাল করে বলল, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! তুই বলতে চাস কোথাও যেতে হলে তুই সেখানে আমার আগে পৌছে যাবি?

কাছিম উদাস মুখে বলল, যেতেও তো পারি!

খরগোস বলল, ঘোড়ার ডিম যাবি!

কাছিম বলল, ঠিক আছে তাহলে দেখা যাক কে আগে গুলিস্তান পৌছাতে পারে!

কত টাকা বাজী?

একশ টাকা।

তাই সই।

সাথে সাথে খরগোস আর কাছিম ছুটতে শুরু করল। খরগোস দৌড়ে গিয়ে একটা স্কুটার থামিয়ে বলল, চল গুলিস্তান!

স্কুটারওয়ালা বলল, তিরিশ টাকা লাগবে কিন্তু আগেই বলে রাখলাম!

লাগলে লাগবে, এখন আর দেরী কর না। খরগোস লাফিয়ে স্কুটারের ওপর উঠল, স্কুটার কাছিমের মুখে কালো ধোঁয়া ছেড়ে সাথে সাথে গুলির মত বের হয়ে গেল।

কাছিম তার মানি ব্যাগটা বের করে দেখল টেনে টুনে কোন রকমে রিক্সা ভাড়াটা হয়। সে একটা রিক্সার সাথে দরদাম করে ভাড়া ঠিক করে রওনা দিল। রিক্সাওয়ালা বুড়ো মানুষ দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে রিক্সা টেনে নিয়ে চলল।

এদিকে স্কুটার ছুটে চলছে গুলির মত, খরগোস চিৎকার করে বলল, আরো জোরে চল। আরো জোরে—

স্কুটারওয়ালা দাঁত বের করে হেসে বলল, এই দেখেন স্যার কত জোরে যাই!

সে তার হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঝড়ের মত ছুটে চলল, রিক্সা টেম্পোকে পিছনে ফেলে, গাড়ী মাইক্রোবাসকে পাশ কাটিয়ে ট্রাকের সাথে পাল্লা দিয়ে সে ছুটে চলল। খরগোস চিৎকার করে বলল, আরো জোরে চল, ব্যাটা কাছিমকে একটা জন্মের মত শিক্ষা দিয়ে যাই—

স্কুটারওয়ালা উৎসাহে মাথা নেড়ে বলল, আপনি স্যার খাটি প্যাসেঞ্জার—সবাই শুধু বলে আস্তে চালাও! আস্তে চালাও! স্কুটার কি আস্তে চালিয়ে কোন মজা আছে?

খরগোস ধমক দিয়ে বলল, কথা বল না এখন, তাড়াতাড়ি চল।

স্কুটার তখন এত জোরে ছুটে চলল যে প্রায় চোখে দেখা যায় না। কোন কিছু যখন বেশী জোরে যায় তখন সেটা ঘোরানো যায় না। স্কুটারওয়ালা দোয়েল চত্বরের কাছে এসে সেটা আবিষ্কার করল, সে যতই চেষ্টা করতে থাকে স্কুটার কিছুতেই ঘুরে না। সে প্রাণপনে হ্যান্ডেল ঘোরানোর চেষ্টা করতেই একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, স্কুটারের একটা চাকা হঠাৎ শূন্যে উঠে গেল এবং স্কুটারটা দুই চাকায় ছুটতে ছুটতে প্রথমে দোয়েল চত্বরে ধাক্কা লেগে প্রায় উড়ে এসে কার্জন হলের গেটে আছড়ে পড়ল সেখানে স্কুটারটা উল্টে গিয়ে উল্টো অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে সেটা সামনে এগিয়ে যায়।

ইউনিভার্সিটির ছেলেরা তখন স্কুটারওয়ালকে আর খরগোসকে আধমরা অবস্থায় টেনে বের করে। যখন ছেলেরা আগে স্কুটারওয়ালাকে ধরে মার লাগাবে না আগে হাসপাতালে নিয়ে যাবে সেটা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করছিল তখন কাছিমের রিক্সাওয়ালা ঘামতে ঘামতে তাকে নিয়ে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে গুলিস্তানের দিকে চলে গেল।

দুর্বচন: কখনোই স্কুটারওয়ালাদের জোরে স্কুটার চালানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিতে হয় না।

সনাতন রূপ: একদিন একটা ক্ষুধার্ত শেয়াল দেখতে পেল গাছের ডাল বেয়ে আঙুরের লতা উপরে উঠে গেছে আর সেখান থেকে থোকা থোকা পাকা আঙুর ঝুলছে। লোভে শেয়ালের জিবে পানি এল, সে লাফিয়ে লাফিয়ে ঐ পাকা আঙুর খাবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু কিছুতেই তার নাগাল পেল না।

অনেক্ষন চেষ্টা করেও কিছুতেই আঙুর খেতে না পেরে সে হতাশ হয়ে সেখান থেকে চলে যেতে যেতে নিজের গাম্ভীর্য্য ধরে রেখে বলল, আঙুর ফল টক।

সুবচন: নীচু মনের মানুষেরা যেটা নিজে পেতে পারে না তার মাঝেই দোষ খুঁজে পায়।

আধুনিক রূপ: একদিন এক শেয়াল অফিস ফেরৎ বাসায় যাচ্ছে। সারাদিনের খাটা খাটুনি ফাইল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি বড় সাহেবের গালাগাল সব মিলিয়ে খুব পরিশ্রম হয়েছে। খিদেও যা পেয়েছে সে আর বলার মত নয়।

বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই দেখতে পেল একটা গাছ বেয়ে বেয়ে আঙুর লতা উঠে গেছে আর সেখান থেকে ঝুলছে টসটসে পাকা আঙুর, বাজারে তার কে.জি একশ টাকার এক পয়সা কম না! শেয়াল এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল আঙুরের মালিককে দেখা যায় কি না, দেখল আশে পাশে কেউ নেই। তখন সে তার হাতের ব্যাগ, টিফিনের কৌটা আর ছাতাটাকে রাস্তার পাশে রেখে একটা লম্বা লাফ দিল। আঙুরগুলি অনেক উপর থেকে ঝুলছে শেয়াল তার নাগাল পেল না। শেয়াল এবার দৌড়ে এসে আরো জোরে একটা লাফ দিল কিন্তু তবু কোন লাভ হল না—আঙুরগুলি তবুও তার নাগালের বাইরে। শেয়াল তবু হাল ছাড়ল না, ঝুলন্ত আঙুরের নীচে দুই পায়ে দাড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করতে লাগল লাফিয়ে চেষ্টা করতে লাগল, দূর থেকে দৌড়ে এসে চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু কিছুই লাভ হল না। শেষ পর্যন্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ঘেমে একাকার হয়ে শেয়াল হাল ছেড়ে দিয়ে যখন রাস্তার পাশে থেকে তার ব্যাগ, টিফিনের কৌটা আর ছাতা তুলে নিচ্ছিল তখন সে দেখতে পেল আঙুর গাছের মালিক তার ঘরের জানালা দিয়ে তার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে আছে। শেয়াল হকচকিয়ে গিয়ে বলল, এই যে ভাই, ভাল আছেন?

মালিক কঠিন গলায় বলল, আপনার মতলব খানা কি? অনেক্ষন থেকে লক্ষ্য করছি আমার আঙুর খাওয়ার চেষ্টা করছেন।

শেয়াল চোখ কপালে তুলে বলল, আমি? কখন?

এই যে দেখলাম লাফিয়ে লাফিয়ে আঙুর ধরার চেষ্টা করছেন।

শেয়াল হা হা করে হেসে বলল, তাই বলেন! আমি আঙুর খাওয়ার জন্যে লাফালাফি করছিলাম না, আমি আসলে ব্যায়াম করছিলাম।

ব্যায়াম?

হ্যাঁ। শরীরকে ঠিক রাখার জন্যে প্রত্যেকদিন বিকালে আমি লাফাই। কার্ডিও ভাসকুলার ব্যায়াম। হার্ট বিট দ্বিগুন করে আধা ঘন্টা ধরে রাখতে হয় এতে হার্টের মাসল শক্ত হয়ে রক্ত প্রবাহ বাড়ে। শরীর শক্ত হয়, ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেসার ধারে কাছে আসতে পারে না। ক্ষুধা বাড়ে, হজম শক্তি দ্বিগুন হয়ে যায়। রাত্রে ভাল ঘুম হয়, মন প্রফুল্ল থাকে—

মালিক আমতা আমতা করে বলল, আমি ভাবছিলাম বুঝি আমার আঙুর খাবার চেষ্টা করছেন!

ধূর! শেয়াল হাত নেড়ে পুরো ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, আঙুর কি একটা খাবার জিনিস হল? ফুড ভ্যালু বলে কিছু নাই শুধু সুগার। আঙুর খাওয়া আর লজেন্স খাওয়ার মাঝে পার্থক্য কি? তা ছাড়া আমি হচ্ছি কার্নিভোরাস। মাংশাষী প্রানী। আমি আঙুর খাব কোন দুঃখে? হা হা হা—

দুর্বচন: আঙুরে কোন ফুড ভ্যালু নেই।

তৃষ্ণার্ত কাক এবং পানির কলসী

সনাতন রূপ: একদিন একটা তৃষ্ণার্ত কাক পানির খোঁজে উড়ে উড়ে শেষ পর্যন্ত একটা পানির কলসী খুঁজে পেল যার তলায় অল্প একটু পানি রয়ে গেছে। পানির পরিমান এত কম যে অনেক চেষ্টা করেও কাক সেই পানির নাগাল পেল না। হঠাৎ কাকের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে কলসীর মাঝে ছোট ছোট নুড়ি পাথর ফেলতে থাকে। কলসীটা যখন নুড়ি পাথরে ভরে যেতে শুরু করল তখন পানিটাও উপরে উঠে আসতে থাকে। পানি যখন কলসীর উপরে উঠে এল বুদ্ধিমান কাকটি সেই পানি খেয়ে তার তৃষ্ণা মেটাল।

সুবচন: প্রয়োজনই নূতন কৌশলের জন্ম দেয়।

আধুনিক রূপ: একটা ছোট শহরে ছিল একটা বুদ্ধিমান কাক এবং শহরের সবাই সেই বুদ্ধিমান কাকের কথা জানত। সে চারটা লেটার পেয়ে এইচ.এস.সি. পাশ করে এখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার কথা ভাবছে। তার বন্ধু আরেক কাক, পড়াশোনায় সেরকম মনোযোগ নেই বাবার পয়সা উড়িয়ে ঘুরে বেড়ায়। একদিন এই দুই কাক ম্যাটিনি সিনেমা দেখে বের হয়েছে। বাইরে তখন কাঠফাটা রোদ খানিকদূর হাটতেই দুজনের তৃষ্ণা পেয়ে গেল। আশে পাশে কোথাও কোন পানি নেই, হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত দেখে একটা পানির কলসী। দুজনে ছুটে গেল কলসীর কাছে, গিয়ে দেখে কলসীর তলায় অল্প খানিকটা পানি পড়ে আছে। দুজনে মিলে অনেক চেষ্টা করেও সেই পানির নাগাল পেল না। কাকের বন্ধু হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, ধুর! ছেড়ে দে, এই পানি খাওয়ার কোন উপায় নেই।

বুদ্ধিমান কাক বলল, এত সহজে হাল ছাড়িস না, দেখ কি বুদ্ধি বের করি।

কি করবি?

দেখছিস না চারিদিকে কত নুড়ি পাথর? নুড়ি পাথরের স্পেসেফিক গ্র্যাভিটি পানি থেকে বেশী। পানিতে ছাড়লেই সেটা ডুবে যাবে।

তাতে লাভ কি হবে?

পানির লেভেলটা উপরে উঠে আসবে!

সত্যি?

সত্যি। আয় এই নুড়ি পাথরগুলি ভিতরে ফেলতে থাকি।

দুজনে মিলে পাথর ফেলতে শুরু করে। পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজ, গরমে দুজনেই ঘেমে উঠে। কলসীর আধা আধি ভরে ফেলে কাক তাকিয়ে দেখে তার বন্ধু আশে পাশে নেই, কখন জানি সরে পড়েছে—বড়লোক বাবার আদরের ছেলে পরিশ্রম করে অভ্যাস নেই। বুদ্ধিমান কাক তবু হাল ছাড়ল না একাই একটা একটা করে নুড়ি পাথর কলসীর মাঝে ফেলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কলসীতে পানির লেভেলটা কলসীর গলা পর্যন্ত উঠে এল।

নুড়ি পাথর গুলি ছিল কাদা মাটিতে মাখামাখি; তাই পানিটাও ছিল ঘোলা, তার উপর সেখানে একটা পোকা ভাসছে পানি দেখে কাকের নাড়ি উল্টে এল, কিন্তু খুব তৃষ্ণা পেয়েছে, উপায় কি? কাক চোখ কান বন্ধ করে কোনমতে সেই পানি খেয়ে ফেলল।

তৃষ্ণা মিটিয়ে কাক উড়ে এসে একটা গাছে বসে দেখে সেই গাছে একটা ডালে হেলান দিয়ে বসে আছে তার বন্ধু। বন্ধুর হাতে একটা কোল্ড ড্রিংক, খুব আয়েশ করে চুমুক দিয়ে খাচ্ছে। তাকে দেখে বলল, মোড়ের দোকানটা খোলা ছিল, ভাবলাম এত কষ্ট করে ঘোলা পানি খেয়ে কি হবে? শেষে আবার ডায়েরিয়া না হয়ে যায়। তার থেকে এই কোল্ড ড্রিংকই ভাল। নে, খাবি নাকি এবং চুমুক?

দুর্বচন: অপরিষ্কার পানি খাওয়া স্বাস্থ্য সম্মত নয়।

বিড়ালের গলায় ঘন্টা

সনাতন রূপ: একটা বিড়াল ইঁদুর ধরে ধরে খেতো, তার উৎপাতে অতিষ্ট হয়ে ইঁদুরেরা একটা সভা ডেকে আলোচনা করতে বসল কেমন করে তাকে শায়েস্তা করা যায়। ইদুঁরেরা নানা রকম প্রস্তাব রাখতে লাগল কিন্তু কোনটাই সবার পছন্দ হয় না। তখন একটা কম বয়সী ইঁদুর দাড়িয়ে বলল, বিড়ালের গলায় একটা ঘন্টা বেঁধে দিলে কেমন হয় তাহলে ঘন্টার শব্দ শুনে আমরা আগে থেকে পালিয়ে যেতে পারব।

প্রস্তাবটা সবার খুব পছন্দ হল কিন্তু হঠাৎ একটা বুড়ো ইঁদুর দাড়িয়ে বলল, প্রস্তাবটা কাজে লাগাতে পারলে কাজ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু আমার প্রশ্ন হল বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?

সুবচন: প্রস্তাব করা সহজ কিন্তু তার বাস্তবায়ন তত সহজ নয়।

আধুনিক রূপ: এক শহরে একটি সন্ত্রাসী বিড়াল থাকত, তার উৎপাতে শহরের সব ইঁদুর অতিষ্ট হয়েছিল। বিড়ালের অত্যাচার আর সহ্য করতে না পেরে একদিন সব ইঁদুরেরা একটা সভা ডাকল। সভায় শহরের ছোট বড় সব ইঁদুর এসেছে। সভার শুরুতে একটা ইঁদুর জ্বালাময়ী একটা বক্তৃতা দিয়ে তাদের দুঃখ কষ্টের বর্ণনা দিল। সন্ত্রাসী বিড়ালের অত্যাচারে তাদের জীবন কেমন বিষময় হয়ে উঠেছে তার কথা বলতে গিয়ে তার মুখে প্রায় ফেনা উঠে গেল। বক্তৃতা শেষ করে সে সবাইকে আহ্বান করল কেমন করে এই অবস্থার একটা সমাধান করা যায় তার প্রস্তাব দেয়ার জন্যে।

ইঁদুরেরা নানারকম প্রস্তাব দিতে থাকে, কেউ ভাড়াটে গুন্ডা লাগিয়ে বিড়লটাকে গুম খুন করে ফেলার কথা বলে, কেউ থানা পুলিশের কথা বলে, কেউ শহর ছেড়ে চলে যাবার প্রস্তাব দেয় কিন্তু কোন প্রস্তাবই আর কারো মনে ধরে না। তখন টিংটিংয়ে একটা ইঁদুর দাড়িয়ে বলল, একটা কাজ করলে হয় না?

কি কাজ?

বিড়ালের গলায় একটা ঘন্টা বেঁধে দিলে কেমন হয়?

ঘন্টা?

হ্যাঁ। তাহলে যখনই ঘন্টা বাজবে তখনই বুঝব বদমাইসটা আসছে আর আমরা টাকা পয়সা নিয়ে সরে যাব!

মোটাসোটা একটা ইঁদুর চোখ বড় বড় করে বলল, বুদ্ধিটাতো খারাপ না!

অন্য সবাই মাথা নেড়ে বলল, একেবারে এক নম্বর বুদ্ধি!

সবাই যখন টিংটিংয়ে ইঁদুরের বুদ্ধির তারিফ করছিল তখন বুড়ো একটা ইঁদুর (কলেজের অংকের প্রফেসর) মাথা দুলিয়ে বলল, বুদ্ধিটা তো সে খারাপ বলে নি, কিন্তু শুধু একটা সমস্যা।

সবাই ঘুরে তাকালো তার দিকে, কি সমস্যা?

সন্ত্রাসী বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে?

ঘরে পিন পতন নিস্তব্ধতা নেমে আসে, সবাই একে অন্যের মুখের দিকে তাকায়, কেউ কোন কথা বলে না। কম বয়সী একটা ইঁদুর রিনরিনে গলায় বলল, সত্যিই তো! ঘন্টাটা বাঁধবে কে?

টিংটিংয়ে ইঁদুর গলা খাকারী দিয়ে বলল, আমি বাঁধব।

তুমি?

হ্যাঁ। তোমরা আমাকে একটা ভাল দেখে ঘন্টা জোগাড় করে দাও আমি সত্যিই বেঁধে দেব।

পরের সপ্তাহে দেখা গেল টিংটিংয়ে ইঁদুর একটা ঘন্টা নিয়ে বাজারের মোড়ে বসে আছে। বিড়াল প্রায়ই বিকেল বেলা মোটর সাইকেলে করে এখানে চাঁদা তুলতে আসে। টিংটিংয়ে ইঁদুর যে ঘন্টাটি নিয়ে বসে আছে সেটা দেখতে সত্যি চমৎকার, এলাকার সেরা কারিগর এটা যত্ন করে তৈরী করেছে। নিখুঁত কাজ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, তার উপর সোনা দিয়ে প্লেটিং করে দেয়া হয়েছে কাজেই একেবারে ঝকঝক করছিল।

কিছুক্ষনের মাঝেই বিড়াল তার মোটর সাইকেল হাকিয়ে বাজারের মোড়ে হাজির হল, টিংটিংয়ে ইঁদুরকে দেখে দাঁত মুখ খিচিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই ব্যাটা কি করছিস এখানে?

কিছু না। একটা ঘন্টা তৈরী করতে দিয়েছিলাম, তৈরী শেষ হয়েছে তাই নিয়ে যাচ্ছি।

ঘন্টা? কিসের ঘন্টা?

গলায় বাঁধার ঘন্টা। জানেন তো আজকাল গলায় ঘন্টা বাঁধা নূতন ফ্যাসন শুরু হয়েছে!

বিড়াল জানত না, তাই মুখ শক্ত করে বলল, তাই নাকি?

জী। সবাই বাঁধছে!

এটা কে বাঁধবে?

আমাদের পাড়ার একটা বিড়াল। যেরকম তার চেহারা সেরকম তার ব্যবহার। পড়াশোনা খেলাধূলা সবকিছুতে ভাল। আমরা সবাই মিলে তার জন্মদিনে এটা উপহার দিচ্ছি। সুন্দর হয়েছে না ঘন্টাটা? কি সুন্দর শব্দ হয় শুনেন—টিংটিংয়ে ইঁদুর তখন ঘন্টাটা বাজিয়ে একবার শুনলো।

সন্ন্যাসী বিড়াল চোখ লাল করে বলল, ঘন্টাটা দে—

টিংটিংয়ে ইঁদুর ভয় পাওয়ার ভাণ করে বলল, কেন, কি করবেন?

বিড়াল ধমক দিয়ে বলল, আমার মুখের উপর কথা, দে বলছি!

টিংটিংয়ে ইঁদুর ঘন্টাটা দেয়ার আগেই বিড়াল ছোঁ মেরে তার হাত থেকে ঘন্টাটা কেড়ে নিয়ে নিজের গলায় বেঁধে ফেলল। তারপর চোখ লাল করে বলল, যা ব্যাটা ভাগ এখান থেকে। কত বড় সাহস—আমার এলাকায় থাকে অথচ আমাকে কোন উপহার না দিয়ে সে উপহার দেয় অন্য বিড়ালকে!

দুর্বচন: সাধারণতঃ বিড়াল নিজেই গলায় ঘন্টা বাঁধে।

সনাতন রূপ: একটা ছেলে নদীর পানিতে গোসল করতে করতে হঠাৎ গভীর পানিতে চলে গিয়ে প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। সে প্রাণপনে চিৎকার করতে থাকে। তার চিৎকার শুনে একজন মানুষ নদীর তীরে এসে দাড়ালো। সে ছেলেটাকে উদ্ধার করার কোন চেষ্টা না করে তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে বকাবকি করতে থাকে। ছেলেটা করুণ স্বরে বলল, আমাকে আগে পানি থেকে তুলুন তারপরে যত ইচ্ছা বকাবকি করতে চান করুন।

সুবচন: বিপদে মুখের কথা নয়, সত্যিকারের সাহায্য চাই।

আধুনিক রূপ: একটা ছেলে নদীর পানিতে গোসল করতে করতে হঠাৎ গভীর পানিতে চলে গিয়ে প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। পানিতে খাবি খেতে খেতে সে প্রাণপনে চিৎকার করতে থাকে। তার চিৎকার শুনে পাশের রাস্তা থেকে একজন লোক ছুটে আসে, সে নদীর তীরে দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হল, চিৎকার করছ কেন?

বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। ছেলেটা পানিতে খাবি খেতে খেতে বলল, আমি ডুবে যাচ্ছি!

তুমি সাঁতার জান না?

না।

সাঁতার না জেনে তুমি নদীর পানিতে নেমেছ? তুমি তো মস্ত বড় আহাম্মক।

ছেলেটা ডুবতে ডুবতে কোনমতে ভেসে উঠে বলল, বাচাঁও!

সাঁতার কত দরকারী জান? মানুষটা দুই হাত নেড়ে বলল, এই দেশে শুধু নদী খাল বিল, যেদিকে তাকাও সেদিকে শুধু পানি সাঁতার না জানলে এই দেশে মানুষ বাঁচবে কেমন করে? শুধু কি তাই? সাঁতার হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম। সাঁতারে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম হয়। বক্ষ প্রসারিত হয়, ফুসফুস শক্তিশালী হয়, হাত পায়ের মাংশপেষী দৃঢ় হয়—

ছেলেটা প্রায় ডুবে যাচ্ছিল কোনমতে মাথাটা উপরে তুলে বলল, বাঁচাও! বাঁচাও আমাকে—

মানুষটা ছেলের কথাকে উপেক্ষা করে বলল, সব মানুষের সাঁতার শেখা উচিৎ। মানুষেরা সাইকেল চালানো শিখে, সিগারেট খাওয়া শিখে, তাশ খেলা

শিখে কিন্তু সাঁতার শিখতে চায় না। সাঁতার না শিখলে বেঁচে থাকবে কেমন করে? পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই হচ্ছে পানি। সাঁতার শিখে আমরা যদি সেই পানিকে সম্মান না দেখাই—

ছেলেটা ডুবতে ডুবতে কোন মতে ভেসে বলল, আগে আমাকে পানি থেকে টেনে তুলেন তারপর না হয় লেকচার দেবেন—

লোকটা উদাস মুখে বলল, আমি তো তোমাকে পানি থেকে টেনে তুলতে পারব না।

ছেলেটা আর্তনাদ করে বলল, কেন?

পানিতে নামব কেমন করে? আমি তো সাঁতার জানি না!

দুর্বচন: সাঁতার না জেনে পানিতে নামতে হয় না।

সনাতন রূপ: একটা শেয়াল একবার ফাঁদে আটকা পড়ে অনেক কষ্টে সেখান থেকে বের হয়ে এল সত্যি কিন্তু তার লেজটি সেই ফাঁদে খোয়া গেল। লজ্জায় অপমানে শেয়ালের মনে হল যদি অন্য সব শেয়ালের লেজও কেটে ফেলা না যায় তাহলে তার বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই।

তাই একদিন সে সব শেয়ালকে ডেকে বলল যে লেজের কোন প্রয়োজন নেই, এটি একটি অপ্রয়োজনীয় বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়। লেজকাটা শেয়ালের কথা শুনে একটি বুড়ো শেয়াল বলল, যেহেতু তোমার নিজের লেজ কাটা গেছে তাই তুমি এই কথা বলছ, না হয় কোনদিন এই কথা বলতে না!

সুবচন: যে ক্ষতিগ্রস্থ সে অন্যদেরও ক্ষতিগ্রস্থ করতে চায়।

আধুনিক রূপ: আমেরিকা থেকে এক লেজকাটা শেয়াল ফিরে এসেছে। লেজ নেই বলে তার লজ্জার শেষ নেই, অন্য শেয়ালদের সামনে সে মুখ দেখাতে পারে না। তার লজ্জার অবসান করার জন্যে একদিন সে সব শেয়ালকে তার বাসার খেতে ডাকল, খাওয়ার আয়োজন ভাল—মুরগীর রোষ্ট, খাসীর কলিজা, ইলিশ মাছের ভাজা এবং খাটি দই।

খাবার শেষে সবাই যখন বাইরে বসে পান খেতে খেতে সিগারেট ধরিয়েছে তখন লেজকাটা শেয়াল বলল, বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে যে আজকে এখানে ডেকে এনেছি তার পিছনে আমার একটা উদ্দেশ্য আছে।

কি উদ্দেশ্য?

লেজ নিয়ে তোমাদের সামনে কথা বলা।

কি কথা?

এক সময়ে আমাদের লেজের কিছু প্রয়োজনীয়তা ছিল, মশা মাছি তাড়ানোর জন্যে সেটা ব্যবহার করা হত। আজকাল এই আধুনিক যুগে লেজের কোন প্রয়োজনই নেই। মশা মাছি দূর করার জন্যে মশার কয়েল, পোকা দূর করার স্প্রে ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া ঘর বাড়ী এয়ার কন্ডিশন করা থাকে পোকা মাকড় ঢুকবে কেমন করে? সত্যি কথা বলতে কি লেজটা আজকাল একটা ফ্যাসান ছাড়া আর কিছু নয়।

সবাই মাথা নেড়ে বলল, একেবারে খাটি কথা!

লেজকাটা শেয়াল মুখ গম্ভীর করে বলল, এই যুগে লেজটা এখন রয়ে গেছে শুধুমাত্র একটা সামাজিক বৈষম্য তৈরী করার জন্যে। আমরা আজকাল লেজ দিয়ে শেয়ালদের মান বিচার করি; যার লেজ যত চক চকে তাকে আমরা তত সমাদর করি, ইলেকশানে ভোট দিই, রাস্তায় দেখা হলে মাথা নীচু করে সালাম দিই। আর যার লেজ ঝিরঝিরে বিবর্ণ তাকে তত উপেক্ষা করি! এটা আমাদের এক ধরণের সামাজিক সমস্যা।

সবাই মাথা নেড়ে বলল, একেবারে সত্যি কথা!

কাজেই, আমার শেয়াল ভাইয়েরা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমরা সবাই যদি আমাদের নিজেদের লেজ কেটে ফেলি তাহলে শেয়ালে শেয়ালে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। শেয়ালদের মাঝে একটা শোষণ মুক্ত সমাজের তৈরী হবে। শেয়ালদের দেখাদেখি তখন অন্য পশুরাও নিজেদের লেজ কেটে ফেলবে। বলা যেতে পারে তখন পশুদের জগতে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হবে। ফরাসী বিপ্লব থেকেও সেই বিপ্লব হবে বেশী কালজয়ী—

সব শেয়ালই লেজকাটা শেয়ালের কথা বিশ্বাসই করে ফেলছিল তখন হঠাৎ একজন বুড়ো শেয়াল বলল, তা বাবা আমার মনে হয় তোমার নিজের লেজ কাটা গেছে বলেই এই কথা বলছ, যদি তা না হত, কখনই এই কথা বলতে না।

বুড়ো শেয়ালের কথা শুনে সবাই হা হা করে হেসে উঠে বলল, সত্যি কথা! সত্যি কথা!

লেজকাটা শেয়ালের অপমানে দুঃখে লজ্জায় প্রায় মরে যেতে ইচ্ছে করছিল, তখন কম বয়সী একজন জিজ্ঞেস করল, তা আপনার লেজটা কাটা গেল কেমন করে?

লেজ কাটা শেয়াল আমতা আমতা করে বলল, আমি যখন আমেরিকা ছিলাম, তখন একদিন—

সবাই চিৎকার করে বলল, আপনি আমেরিকা ছিলেন?

হ্যাঁ।

কতদিন?

প্রায় বছর পাঁচেক।

সেটা তো আগে বলবেন ! আমরা বুঝতে পারি নাই ভাই মাপ করে দিবেন। একজন আমেরিকা ফেরৎ মানুষের কথা আমরা অবিশ্বাস করে ফেলছিলাম, কি সর্বনাশ!

সবাই মাথা নেড়ে বলল, কি সর্বনাশ! কি সর্বনাশ!

কম বয়সী শেয়ালটি বলল, চল সবাই লেজ কেটে ফেলি আমাদের।

চল, চল, আর দেরী করে কাজ নেই।

ব্যথা করবে না তো আবার?

করলেই আর কত ব্যথা করবে? লেজের গোড়ায় একটা ইনজেকশান দিয়ে স্টেরিলাইজড চাকু দিয়ে কপ করে কেটে ফেলবে। তারপর কাটা জায়গায় একটা এন্টিসেপটিক লোশান লাগিয়ে দেবে, দুই দিনে ঘা শুকিয়ে যাবে! যদি চাও একটা এন্টিবায়োটিকের কোর্স শুরু করতে পার—

পরের দিনই সব শেয়াল নিজেদের লেজ কেটে ফেলল। বুড়োমত শেয়ালটা একটু গাঁইগুই করছিল অন্যেরা জোর করে ধরে তার লেজটাও কেটে দিল।

দুর্বচন: বিদেশের এক্সপার্টদের কথা অমৃত সমান!

সিংহের প্রেম

সনাতন রূপ: এক সিংহ এক কৃষক মেয়ের প্রেমে পড়ে গিয়ে তাকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হয়ে গেল। মেয়ের বাবা এরকম একজন জামাইয়ের কাছে নিজের মেয়েকে দিতে অনিচ্ছুক ছিল আবার সোজাসুজি না বলে সিংহকে রাগাতেও সাহস পাচ্ছিল না। কাজেই সে অনেক ভেবে একটা বুদ্ধি বের করল, সে সিংহকে বলল, তুমি আমার মেয়ের জন্যে চমৎকার জামাই হবে কিন্তু আমার মেয়ে তোমার বড় বড় নখ এবং দাঁতকে খুব ভয় পায়। বিয়ের আগে তাই তোমার দাঁত গুলি তুলে নখগুলি কেটে ফেলা দরকার।

সিংহ এতই গভীর প্রেমে পড়েছিল যে সে সাথে সাথেই রাজী হয়ে গেল। কৃষক তখন সিংহের দাঁত গুলি তুলে আর নখ গুলি কেটে ফেলল। এখন তাকে ভয় পাবার কিছু নেই কৃষক তখন একটা মুগুর দিয়ে পিটিয়ে সিংহকে তাড়িয়ে দিল।

সুবচন: যারা না ভেবে চিন্তে প্রেমে পড়ে যায় তাদের কপালে অনেক দুঃখ।

আধুনিক রূপ: এক চেয়ারম্যানের মেয়ে রূপে গুনে অতুলনীয়া, গ্রামের কলেজে সে আই.এ.পড়ে। যেমন তার গায়ের রং সেরকম তার চেহারা, আবার পড়াশোনাতেও তার কোন জুরি নেই। শুধু তাই নয় তার গলার সুর এত চমৎকার যে আন্তঃজেলা সংগীত প্রতিযোগিতায় সে দ্বিতীয় স্থান দখল করে ফেলল। রূপে গুনে এরকম চমৎকার একটি মেয়ের অনেক অনুরাগী ভক্ত থাকবে বলাই বাহুল্য। কাজেই আশে পাশে কয়েক গ্রামের অনেক ছেলেরা তার প্রেমে হাবুডুবু খেতো। সবচেয়ে বেশী যে হাবুডুবু খেতো সে হচ্ছে একটা সিংহ। সেই সিংহ বনের ধারে জারুল গাছে হেলান দিয়ে মেয়েকে কলেজে যেতে এবং আসতে দেখে প্রত্যেকদিন বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলত। প্রেমের জ্বালা সইতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সে একদিন মেয়ের বাসায় গিয়ে হাজির। মেয়ের চেয়ারম্যান বাবা সিংহকে দেখে খুব ঘাবড়ে গেলেন, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, কি বাবা সিংহ, আপনি কি মনে করে?

আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

কি প্রস্তাব?

বিয়ের প্রস্তাব।

কার বিয়ে?

সিংহ কেশে গলা একটু পরিষ্কার করে বলল, আমার পরিবারে মুরুব্বী কেউ নেই তাই নিজেই আনলাম প্রস্তাবটা। আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই—

চেয়ারম্যান ভিতরে ভিতরে খুব ভয় পেয়ে গেলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করল না। বলল, না না কিস্তু মনে করি নাই। কিন্তু কথা হল আজকাল এরা নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করে। তোমার মত একজন জামাইকে বিয়ে করবে বলে তো মনে হয় না।

সিংহ মুখ কাল করে বলল, কেন করবে না?

মেয়ে আমার খুব কোমল স্বভাবের, কিন্তু তোমার এত বড় বড় দাঁত আর নখ, মনে হয় দেখেই ফিট হয়ে যাবে। তোমার দাঁত গুলি যদি তুলে ফেল আর নখগুলি যদি কেটে ফেল তবু মনে হয় একটা আশা আছে।

সিংহ প্রেমে এতই হাবুডুবু খাচ্ছিল যে সাথে সাথে রাজী হয়ে গেল, বলল, দাঁত আর নখ তো তুচ্ছ আপনার মেয়ের জন্যে আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে রাজী আছি।

কিছুক্ষণের মাঝেই চেয়ারম্যান সাড়াশী, করাত হাতুড়ী ছেনী ইত্যাদি নিয়ে হাজির হল। সিংহকে চিৎ করে শুইয়ে বেশ কয়জন তাকে শক্ত করে ধরে রাখল, চেয়ারম্যান তখন সাড়াশী দিয়ে একটা একটা করে দাঁত টেনে টেনে তুলে ফেলল। তারপর কয়েকজন মিলে করাত দিয়ে নখ গুলি কেটে র‍্যাদ দিয়ে ঘষে ঘষে সেগুলি ভোতা করে ফেলল।

সিংহ তখন বলল, তাহলে কি আমি এখন কাজীকে ডেকে আনব?

চেয়ারম্যান একটা বড় মুগুর দিয়ে সিংহের পিছনে মেরে বলল, কাজী? ব্যাটার সাহস তো কম না আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চায়! ভাগ এখান থেকে বেকুব কোথাকার।

সিংহ হতচকিত হয়ে চেয়ারম্যানের দিকে তাকাল, ভাঙ্গা গলায় বলল, তার মানে আপনি আমার সাথে এতক্ষন মিথ্যা কথা বলেছেন?

মিথ্যা নয়তো কি? চেয়ারম্যান চিৎকার করে বলল, কোনদিন শুনেছিস মানুষ সিংহকে বিয়ে করে? ভাগ ব্যাটা বদমাইস—

চেয়ারম্যান তখন মুগুর দিয়ে সিংহকে বেধরক পিটাতে পিটাতে বলল, দূর হ এখান থেকে।

চেয়ারম্যানের দেখা দেখি তার চেলা চামুন্ডারাও লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে এল সবাই মিলে সিংহকে পেটাতে শুরু করল। সিংহ চোখের পানি মুছে বলল,

আপনার মেয়েকে যদি না পাই আমার এই জীবনের কোন অর্থ নেই। মৃত্যুই আমার কাম্য, আপনারা আমাকে মেরেই ফেলেন।

তখন সিংহ ভাঙ্গা গলায় হিন্দী সিনেমায় দেখা গান গাইতে শুরু করল, ইয়ে জিন্দেগী বরবাদ হ্যায়...

এদিকে বাড়ীর ভিতর জানালা থেকে চেয়ারম্যানের মেয়ে পুরো ব্যাপারটা দেখছিল। হঠাৎ করে সিংহের গান শুনে তার বুকের ভিতরেও ভালবাসার বাণ ডেকে গেল। সে চিৎকার করে বলল, থাম তোমরা থাম, সিংহকে তোমরা মেরো না।

সবাই অবাক হয়ে বলল, মারব না ?

না।

কেন ?

মেয়ে তখন হিন্দী সিনেমার নায়িকাদের মত চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দিয়ে বলল, পৃথিবীতে একমাত্র অবিনশ্বর অনুভূতি হচ্ছে ভালবাসা। খাটি ভালবাসা হচ্ছে স্বর্গীয় তার অবমাননা করা হচ্ছে সৃষ্টিকে অবমাননা করা—ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডায়লগ শেষ করে মেয়ে সিংহের বুকে ঝাপিয়ে পড়ল তখন সিংহ তাকে আলিঙ্গন করে দুজনে মিলে এক সাথে গান গাইতে শুরু করল, হাম তোমারা—তোম হামারা...

তখন বৃষ্টি শুরু হল এবং বৃষ্টির মাঝে ভিজে কাপড়ে চেয়ারম্যানের মেয়ে শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে অত্যন্ত আপত্তিকর ভঙ্গীতে নাচতে শুরু করল।

দুর্বচন: প্রেম ভালবাসার জন্যে হিন্দী সিনেমার উপরে কোন ওষুধ নেই!

সনাতন রূপ: এক সময় সিংহ পৃথিবীর সব জন্তু জানোয়ারকে শাসন করত, সে ছিল একজন তেজস্বী এবং ন্যায় বিচারক সম্রাট। শুধু তাই নয় একজন সত্যিকারের সম্রাটের যেটুকু দয়ালু হওয়ার কথা সিংহ ছিল ঠিক ততটুকু দয়ালু।

একদিন সিংহ সব জন্তুকে ডেকে বলল তার সাম্রাজ্যে আজ থেকে সব জন্তু জানোয়ার পাশাপাশি থাকবে। নেকড়ে এবং ভেড়া, বাঘ এবং হরিণ, চিতা বাঘ এবং ছাগল, কুকুর এবং খরগোস কারো সাথে কারো কোন ভেদাভেদ নেই। সবাই একে অন্যকে ভালবাসবে এবং পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করবে।

যখন খরগোস সিংহের কথা শুনল সে খুশীতে আত্মহারা হয়ে বলল, আমি কতদিন থেকে এই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করছি, যখন দুর্বল সবলের পাশের থাকতে পারবে কোন রকম ভয়ভীতি ছাড়া !

সুবচন: মহত্ত্ব হচ্ছে সত্যিকারের শক্তির উৎস।

আধুনিক রূপ: দেশে ইলেকশানে অনেক ভোট পেয়ে সিংহ শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন শুরু হতেই সে ঘোষণা করে দিল, এই দেশে আজ থেকে পশুতে পশুতে কোন ভেদাভেদ নেই। নেকড়ে বাঘ আর ভেড়া এক ফ্ল্যাটে থাকবে, বাঘ গরু এক অফিসে যাবে, কুকুর আর খরগোস এক কলেজে পড়বে। কারো সাথে কারো কোন পার্থক্য নেই, সবার সমান অধিকার। এখন থেকে কেউ কাউকে খেতে পারবে না—

সিংহের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর তার দলের সব পশুরা প্রচন্ড করতালিতে জাতীয় পরিষদের ভবন প্রায় ফাটিয়ে ফেলল। তখন বিরোধী দলের নেতা দাড়িয়ে বলল, আর গাছ পালা? সংখ্যা লঘু বলে কি তাদের জীবন নেই? তাদের কি এই দেশে বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই?

সিংহ মাথা নেড়ে বলল, খাটি কথা। গাছপালারও জীবন আছে, তাদেরকেও কেউ খেতে পারবে না।

পোকা মাকড় কীট পতঙ্গ?

আজ থেকে তাদের জীবনও নিরাপদ।

সিংহের কথা শুনে চারিদিকে সাধু সাধু রব উঠতে থাকে। রেডিও টেলিভিশনে সেই খবর প্রচারিত হল। খবরের কাগজে মহানুভব সিংহের

সাম্যবাদী স্বপ্নের কথা নিয়ে বড় বড় সম্পাদকীয় এবং উপ সম্পাদকীয় লেখা হল। সব মিলিয়ে সারা দেশে সব রকম পশুদের মাঝে আনন্দের একটা জোয়ার বয়ে যেতে শুরু করে।

যেহেতু দেশে আইন জারী হয়েছে কেউ গাছ পালা তৃণ লতা ঘাস পাতা খেতে পারবে না তাই কিছুদিনের মাঝেই গরু ছাগল হরিণ খরগোস এবং অন্যান্য সব তৃণভোজী প্রাণী না খেতে পেয়ে মারা গেল। বাঘ, সিংহ, নেকড়ে ভালুক এই ধরনের মাংশষী প্রাণীরা অন্য প্রাণীদের খেতে না পেরে একটি একটি করে সবাই মারা পড়ল। কীট পতঙ্গ শস্য দানা খেতে না পেরে পাখীরাও মারা গেল কিছুদিনের মাঝে।

সিংহের বিশাল সাম্রাজ্য দেখতে দেখতে প্রাণহীন মৃত রাজ্য হয়ে গেল।

দুর্বচন: ফুড চেইন ভাঙতে হয় না।

সনাতন রূপ: একটা নেউল একজন মানুষের ঘর থেকে হাস মুরগী চুরি করে খেতো। একদিন সে নেউলটাকে ধরে ফেলল। সে যখন সেটাকে পানিতে ডুবিয়ে মারার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল নেউলটা কাতর গলায় বলল, দোহাই তোমার, তুমি আমাকে মেরো না, আমি কি তোমার বাসা থেকে ইঁদুর ছুচো এই সব ধরে ধরে নিই নি?

মানুষটা বলল, তা সত্যি, তুমি কিছু কিছু ইঁদুর ছুচো এইসব ধরে ধরে মেরেছ। কিন্তু তার সাথে সাথে তুমি আমার এত হাঁস মুরগী ধরে ধরে খেয়েছ যে তোমার অপকার উপকার থেকে অনেক বেশী। তোমাকে মারা ছাড়া আমার কোন গতি নেই।

সুচবন: মানুষের ভাল কাজ তার খারাপ কাজ থেকে বেশী হওয়া দরকার।

আধুনিক রূপ: একাত্তরে একটা নেউল ধরা পড়েছে। সে মুখে ধর্মের কথা বলে এরকম একটা দলের সদস্য ছিল। যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মানুষকে মারতে শুরু করেছে তখন সে তার দলের অন্য অনেকের মত রাজাকারে যোগ দিয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর একটা দল তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে সুপারী গাছের সাথে বেঁধে রেখেছে। অপরাধের বিচার করে যখন তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে অস্ত্র তোলা হয়েছে, তখন রাজাকার নেউলটি বলল, তোমরা সত্যি সত্যি আমাকে মেরে ফেলবে না?

কে বলেছে মারব না? মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বলল, তোর মত বিশ্বাসঘাতক খুনীদের এই দেশে কোন স্থান নেই।

কিন্তু আমি তো এই দেশের মানুষের অনেক উপকারও করেছি।

কি উপকার করেছিস?

কাজেম আলীর ছেলে মুক্তিবাহিনীতে গিয়েছিল, তার বাড়ী জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছি। এখন সারা গ্রামের মানুষ বাসন মাজার জন্যে সেখান থেকে ছাই নিতে পারে।

মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আর কি উপকার করেছিস?

পাকিস্তান মিলিটারীদের জলীল মিয়ার বাড়ী নিয়ে গিয়েছি। জলীল মিয়ার বড় ছেলেটাকে মিলিটারীরা গুলি করে মেরেছে। জলীল মিয়া গরীব মানুষ, ছেলে মরে যাওয়ায় তার খরচ কমেছে।

কমান্ডার দাঁত কিড়মিড় করে বলল, আর কি উপকার করেছিস?

নেউল বলল, কেরামত আলীর মেজো মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। মিলিটারী বাবারা এসেছিলেন গ্রামে। তাদের জন্যে সেই মেয়েটাকে ধরে দিয়ে দিয়েছিলাম। একটা বিয়ের কত খরচ, কত ঝামেলা—সব কিছু বেঁচে গেল।

নেউল আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার আর সহ্য করতে পারল না, তার রাইফেল গর্জে উঠল।

দুর্বচন: বিশ্বাসঘাতকদের স্থান এদেশে নয়।

দুই ব্যাঙ

সনাতন রূপ: দুই ব্যাঙ ছিল একে অন্যের পড়শী। তাদের একজন থাকত ডোবায় সেখানে সারা বছরই প্রচুর পানি। অন্যজন থাকত রাস্তার পাশে একটা গর্তে শুধু বৃষ্টি হলে সেখানে ছিটেফোটা পানি জমত। একদিন দুই ব্যাঙের দেখা হয়েছে, ডোবার ব্যাঙ রাস্তার ব্যাঙকে সাবধান করে দিয়ে ডোবায় চলে আসতে বলল দুই কারনে। প্রথমতঃ ডোবায় সারা বছরই পানি থাকে দ্বিতীয়তঃ রাস্তা থেকে সেটা নিরাপদ অনেক বেশী।

রাস্তার ব্যাঙ বলল সে তার বাসস্থানে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে আর নূতন জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে নেই।

কয়দিন পর একটা বড় গাড়ী সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, রাস্তার ব্যাঙ সেই গাড়ীর চাকার তলায় চাপা পড়ে মারা গেল।

সুবচন: কোন কিছুতেই বেশী অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া ভাল নয়।

আধুনিক রূপ: দুই ব্যাঙ ছিল পড়শী। একজন থাকত একটা নীচু বিলের পাশে ডোবায়। সেখানে প্রচুর পানি। ব্যাঙ সেখানে মহানন্দে সাতাঁর কেটে বেড়াত। অন্য ব্যাঙটি থাকত রাস্তার পাশে গর্তে, সেখানে জায়গাটি ছোট হলেও আশে পাশে শহরের নানারকম উত্তেজনা থাকত সর্বক্ষন। একদিন তাদের স্কুল রিইউনিয়নে দুই ব্যাঙের দেখা হল। ডোবার ব্যাঙ তখন রাস্তার ব্যাঙকে বলল, তুই এখনো রাস্তার কাছে গর্তে আছিস?

রাস্তার ব্যাঙ মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ আছি।

তোর অসুবিধে হয় না?

অসুবিধে? কিসের অসুবিধে?

রাস্তার পাশে থাকায় কত রকম অসুবিধে! ব্যাঙদের জন্যে সবচেয়ে প্রথম দরকার পানি। রাস্তার পাশে তুই পানি পাবি কোথায়? আমি থাকি বিলের কাছে এক ডোবায় সেখানে সারা বছর পানি। সাঁতার কাটি, ঘুরে বেড়াই কত রকম মজা হয়।

রাস্তার ব্যাঙ বলল, আমার রাস্তার পাশেই অভ্যাস হয়ে গেছে কোন অসুবিধে হয় না।

যখন পানি থাকে না তখন?

রাস্তার ব্যাঙ মাথা নেড়ে বলল, সত্যি কথা বলতে কি সেটা কখনোই হয় না। সারা বছরই কোন না কোনভাবে পানি পেয়ে যাই।

সারা বছর পানি পেয়ে যাস? ডোবার ব্যাঙ অবাক হয়ে বলল, কেমন করে?

যেমন মনে কর বর্ষাকাল, একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তাঘাট ডুবে যায় পানি থই থই করতে থাকে। বর্ষাকালটা শেষ হতেই বন্যার মরশুম আসে, বন্যার পানিটা একবার এসে গেলেই কয়েক সপ্তাহের জন্যে নিশ্চিন্ত। সেই পানি যখন শুকিয়ে আসে তখন রাস্তা কাটা শুরু হয়। প্রথমে কাটে ওয়াসা, সেই গর্তে পানি জমে থাকে। ওয়াসা যখন গর্ত বুঁজে দেয় তখন টেলিফোনের লাইনের জন্যে রাস্তা কাটে, সেটা শেষ হবার পর মিউনিসিপ্যালিটি—একটা না একটা লেগেই আছে।

আর পানি?

পানির কোন অসুবিধে নেই। পানির পাইপ হরদম ফেটে যাচ্ছে—ভুল করে কেটে ফেলছে। চারিদিক সব সময় থই থই পানি।

ডোবার ব্যাঙ একটু ইতস্ততঃ করে বলল, কিন্তু রাস্তায় এত গাড়ী-ট্রাক কোনদিন গাড়ী চাপা পড়বি। শুনেছি ট্রাকগুলি নাকি খুব খারাপভাবে যায়—

তা ঠিক। রাস্তার ব্যাঙ মাথা নেড়ে বলল, শহরে থাকলে ঐ আশংকাটা সব সময়েই থাকে। সব সময়ে একটু সাবধানে থাকতে হয়। সবাই থাকে আমিও থাকি!

কয়দিনের মাঝেই জাপানের সহযোগিতায় শহরের বাইরে একটা সার কারখানা তৈরী হল। অনেক বড় কারখানা, মন্ত্রীরা এসে হৈ চৈ করে সেটা ফিতা কেটে উদ্বোধন করলেন। কিছুদিনের মাঝেই সার কারখানা চালু হল। কারখানার বর্জ্য ক্যামিকেল ডোবার পানিতে ফেলে দেয়া শুরু করল। দেখতে দেখতে ডোবার পানি বিষাক্ত হয়ে যায়। ডোবার মাছ গুলি প্রথমে মরে ভেসে উঠল। ডোবার ব্যাঙের গায়ে চাকা চাকা দাগা দেখা গেল, চোখের নীচে ঘা। হজমের গোলমাল, রাতে ঘুমুতে পারে না। শরীরে শক্তি নেই খাবারে রুচি নেই। ব্যাঙ শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল।

এইভাবে কয়দিন ভুগে ব্যাঙ তার চার হাত পা উপরে তুলে পেট ভাসিয়ে মারা পড়ল।

দুর্বচন: কল কারখানা পরিবেশকে দূষিত করতে পারে।

সনাতন রূপ: একদিন নেকড়ে বাঘ নদীতে পানি খাচ্ছে হঠাৎ সে দেখতে পায় একটা ছোট ভেড়া শাবকও খানিক দুরে নদীর পানিতে খেলা করছে। ভেড়া শাবকটি দেখে নেকড়ের খুব লোভ হল, কিন্তু তার ঘাড় মটকানোর আগে একটু ছুতো খুঁজে পাওয়া চাই। তাই সে হুংক. য় বলল, আমার খাবার পানি কেন তুই নোংরা করছিস?

ভেড়ার বাচ্চা বলল, আপনার পানি আমি কেমন করে নোংরা করব? পানির স্রোত তো বইছে উল্টো দিক দিয়ে। এটা আসছে আপনার কাছ থেকে আমার কাছে, আমার কাছে থেকে তো আপনার কাছে যাচ্ছে না।

আমার মুখের উপর কথা? এক বছর আগে গালি দিয়েছিলি কেন?

এক বছর আগে তো আমার জন্মই হয় নি।

তোর যদি জন্ম না হয়ে থাকে তাহলে সেটা ছিল তোর বাবা। একই কথা। শাস্তি তোকে পেতেই হবে।

এই বলে নেকড়ে বাঘ লাফিয়ে পড়ল ভেড়ার শাবকের উপরে ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলল তাকে।

সুবচন: অত্যাচারীরা দুর্বলদের আঘাত করার জন্যে সব সময়েই কোন না কোন ছুতো খুঁজে বের করে।

আধুনিক রূপ: একদিন এক নেকড়ে বাঘ নদীতে পানি খাচ্ছে হঠাৎ দেখতে পেল দুরে একটা নাদুস নুদুস ভেড়ার বাচ্চা নদীর পানিতে খেলা করছে। ভেড়ার বাচ্চাকে দেখে নেকড়ের মুখে পানি এল সাথে সাথে। সে দুই পা এগিয়ে লাফিয়ে পড়ল ভেড়ার বাচ্চার উপর, কামড়ে ধরল তার ঘাড়—

ভেড়ার বাচ্চা চিৎকার করে বলল, কি করেছি আমি? কেন তুমি আমাকে ধরেছ?

নেকড়ে বলল, কিছুই করিস নি তুই।

তাহলে কেন আমাকে ধরেছ?

ধরেছি কারন ইচ্ছে হয়েছে। তোকে আমি খাব?

খাওয়ার ইচ্ছে হলেই তুমি আমাকে খাবে? দেশে আইন নেই?

থাকলে আছে, কিন্তু আমার জন্যে আইন নেই!

কেন নেই ?

কারণ আমি সরকারী দলের রাজনীতি করি।

ভেড়ার বাচ্চা ভয়ে ভয়ে নেকড়ের দিকে তাকাল, নেকড়ে হা হা করে হেসে বলল, শুনে রাখ ব্যাটা শুধু যে আমি সরকারী দলের রাজনীতি করি তাই না, আমার পরিচিত মন্ত্রী আছে দুইজন। আমার দুর সম্পর্কের এক চাচা আর্মীর জেনারেল। মেজো খালু পুলিশের এস.পি। আমার বড় ফুপা হাইকোর্টের এটভোকেট, আমার মামা পার্লামেন্টের এম.পি.। গুলশানে আর বারিধারায় আমার দুইটা বাড়ী। ব্যাংকে আমার দেড় কোটি টাকা। আমার যাই ইচ্ছে হয় তাই করতে পারি।

এই বলে নেকড়ে ভেড়ার বাচ্চার ঘাড় মটকে ফেলল।

দুর্বচন: সরকারী দলের রাজনীতি করলে যা ইচ্ছে হয় তাই করা যায়।

সনাতন রূপ: একজন মানুষের কয়েকজন ছেলে ছিল যারা দিনরাত নিজেদের মাঝে ঝগড়া করত। অনেক চেষ্টা করেও সে তাদের মিলে মিশে থাকা শেখাতে পারল না। ছেলেদের ঝগড়া বিবাদে অতিষ্ট হয়ে একদিন সে তাদের শিক্ষা দেবার জন্যে অনেকগুলি কাঠির একটা আঁটি নিয়ে তার ছেলেদের দিল ভাঙ্গার জন্যে। ছেলেরা একে একে সবাই সেই আঁটি ভাঙ্গার চেষ্টা করল কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই সেটা ভাঙ্গতে পারল না। মানুষটি তখন আঁটি খুলে একটা একটা করে কাঠি তার ছেলেদের দিয়ে সেটা ভাঙ্গতে বলল। ছেলেরা এবারে খুব সহজেই সেটা ভেঙ্গে ফেলল।

মানুষটি তখন তার ছেলেদের বলল, তোমরা যদি এই আঁটির মত একতাবদ্ধ থাক তাহলে তোমার শক্ররা কখনোই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু তোমরা যদি আলাদা আলাদা থাক, শত্রুরা খুব সহজেই তোমাদের ধ্বংস করে ফেলবে।

সুবচন: একতাই বল।

আধুনিক রূপ: আজিমপুর কলোনীতে থাকত একজন সরকারী চাকুরে। তার চার ছেলে, ছেলেগুলি ভারী দুষ্টু, পাড়ার বখা ছেলেদের সাথে মিশে আরো দুষ্টু হয়ে গেছে। যখন বাসার ভিতরে থাকে তখনও একে অন্যের সঙ্গে ঝগড়া করছে। কে আগে খাবে, কে আগে বাথরুম যাবে এই সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তারা দিনরাত একে অন্যের সাথে লেগে থাকে। বাবা সারাদিন অফিস করে এসে রাতে বাসায় ফিরে ছেলেদের ঝগড়া ঝাটি দেখে একেবারে অতিষ্ট হয়ে গেলেন। কিছুতেই না পেরে একদিন নিউমার্কেট থেকে এক ডজন পেন্সিল কিনে এনে সব ছেলেকে ডেকে বললেন, এই যে এক ডজন পেন্সিল। দেখি তোরা একসাথে সবগুলি ভাঙ্গতে পারিস কি না।

বড় ছেলে জিজ্ঞেস করল, কেন বাবা? পেন্সিল ভেঙ্গে কি হবে? আর এতগুলি পেন্সিল যদি ভেঙ্গে ফেলি মা শুনলে অনেক রাগ করবে।

করুক। তুই ভাঙ্গ দেখি।

প্রথমে বড় ছেলে পেন্সিলগুলি ভাঙ্গার চেষ্টা করল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ভাঙ্গতে পারল না। তারপর অন্য ছেলেরাও একে একে চেষ্টা করল কিন্তু তারাও

ভাঙ্গতে পারল না। এক সাথে এক ডজন পেন্সিল ভেঙ্গে ফেলা খুব সহজ ব্যাপার নয়।

বাবা তখন পেন্সিলগুলি আলাদা করে একটা একটা পেন্সিল সবাইকে দিয়ে বললেন, দেখি এখন তোরা ভাঙ্গতে পারিস কি না।

ছেলেরা চোখের পলকে মট করে পেন্সিল গুলি ভেঙ্গে ফেলল। বাবা তখন বললেন, তোরা হচ্ছিস এই পেন্সিল গুলির মত। যদি নিজেদের মাঝে ঝগড়া ঝাটি করে আলাদা আলাদা থাকিস তাহলে যে কেউ তোদের ভেঙ্গে ফেলবে। কিন্তু যদি সবাই এক সাথে মিলে মিশে থাকিস তাহলে কেউ তোদের স্পর্শ করতে পারবে না।

বাবার এত বড় একটা বক্তৃতা এবং হাতে কলমে দেখিয়ে দেয়ার পরেও ছেলেদের কোন পরিবর্তন হল না, বরং মা এসে ভাঙ্গা পেন্সিলগুলি দেখে ছেলেদের এবং বাবার উপর খুব রাগ করলেন।

বহুদিন পর বড় ছেলেটি পড়াশোনা শেষ করে বিদেশে গিয়ে আমেরিকার নিউ জার্সীতে স্থায়ী হল। সেখানে তার মত আরো অনেক বাঙালী বাসা বেঁধেছে, কিন্তু সবাই আলাদা আলাদা থাকে, নিজেদের মাঝে যোগাযোগ নেই। বিদেশে বাঙালীদের এভাবে আলাদা আলাদা থাকতে দেখে হঠাৎ ছেলেটির তার বাবার কথাটি মনে পড়ল এবং প্রথমবার কথাটির মাঝে কতটুকু সত্য লুকিয়েছিল বুঝতে পারল।

বড় ছেলে একদিন সব বাঙালীদের ডেকে বলল, আমরা এখানে সবাই নিজের দেশ ছেড়ে এসেছি কিন্তু কেউ দেশকে ভুলতে পারি নি। সব সময় আমাদের দেশের কথা মনে হয়। দেশের সংস্কৃতি, দেশের ভাষার কথা মনে হয়। আমরা যদি এখানে আমাদের নিজেদের মাঝে দেশের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই দেশের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই তাহলে আমাদের সংঘবদ্ধ ভাবে থাকতে হবে। যদি না থাকি তাহলে আমাদের ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

সবাই জিজ্ঞেস করল, তাহলে এখন আমাদের কি করতে হবে?

বড় ছেলে বলল, আমাদের একটা সমিতি করতে হবে।

সবাই মাথা নেড়ে বলল, সত্যি কথা!

তখন সবাই মিলে তারা একটা বাংলাদেশ সমিতি তৈরী করল। সমিতিতে প্রায় সবাই যোগ দিল, তবে কয়েকজন জানাল তাদের সভা সমিতি ভাল লাগে না, তারা আলাদাই থাকতে চায়। তাদেরকে কেউ আর সমিতিতে যোগ দেয়ার জন্যে জোর করল না।

খুব উৎসাহ নিয়ে সমিতির কাজ শুরু হল। স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, শহীদ দিবসে গান বাজনা বক্তৃতা হতে লাগল। ছুটি ছাটায় সবাই মিলে পার্কে পিকনিক করতে বের হল। জন্মদিন বিবাহ বার্ষিকীতে সমিতির লোকজন আনন্দ করতে লাগল।

বছর না ঘুরতেই কে সমিতির প্রেসিডেন্ট হবে এবং কে সমিতির সেক্রেটারী হবে সেটা নিয়ে তুমুল ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়ে গেল। একে অন্যকে রাজাকার এবং ইন্ডিয়ার দালাল বলে গালিগালাজ করতে লাগল। সমিতির সদস্যরা বাঙালী না বাংলাদেশী সেটা নিয়ে খুনোখুনি হয়ে যাবার মত অবস্থা হল। কিছুদিনের মাঝেই সমিতি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল তখন এক সমিতি অন্য সমিতির বিরুদ্ধে মামলা করতে লাগল, থানা পুলিশ করতে লাগল। কয়েকবার সত্যি সত্যি হাতাহাতি হয়ে গেল এবং পুলিশ এসে কয়েকজনকে ধরে হাজতে নিয়ে গেল। সেটা নিয়ে মামলা মোকদ্দমা করে বেশ কয়েকজন সর্বসান্ত হয়ে গেল। যাদের ব্লাড প্রেসার বেশী তাদের একজনের স্ট্রোক হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে গেল, দুজনের হার্ট এটাক হল। বেশীর ভাগ বাঙালীদের নিজেদের মাঝে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে গেল। স্থানীয় বাংলা পত্রিকায় একজন অন্যজনকে কুৎসিত ভাষায় গালি গালাজ করতে থাকে এবং হঠাৎ করে পত্রিকার সার্কুলেশান দ্বিগুন হয়ে গেল।

শুধুমাত্র যে কয়জন মানুষ বাংলাদেশ সমিতিতে যোগ দেয় নি, তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

দুর্বচন: বিদেশে বাংলাদেশ সমিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক বস্তু।

সিংহ ও ইঁদুর

সনাতন রূপ: একটা ছোট ইঁদুর ঘুমন্ত সিংহের মুখের উপর দিয়ে ছোটাছুটি করতে গিয়ে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। সিংহ খুব রেগে ইঁদুরটাকে ধরে মেরেই ফেলছিল তখন ইঁদুর খুব কাকুতি মিনতি করে তাকে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও, একদিন হয়তো আমি তোমাকে রক্ষাও করতে পারি।

ইঁদুরের কথা শুনে সিংহ হেসেই বাঁচে না, তবু কি মনে করে তাকে ছেড়ে দিল।

তারপর অনেকদিন পার হয়ে গেছে হঠাৎ একদিন সেই সিংহ একটা শিকারীর জালে আটকা পড়ে গেল। সিংহের গর্জন শুনে ইঁদুর ছুটে এসে তার ধারালো দাঁত দিয়ে জালের দড়ি কাটতে থাকে। কিছুক্ষনের মাঝেই সিংহ মুক্তি পেয়ে যায়। ইঁদুর বলল, দেখেছ, তুমি আগে বিশ্বাস কর নি, কিন্তু প্রয়োজনে একটা ছোট ইঁদুরও তোমাকে রক্ষা করতে পারে।

সুবচন: ভাল কাজের প্রতিদান পাওয়া যায়।

আধুনিক: সিংহ একটা মালটিন্যাশনাল কোম্পানীর জি.এম.। নেংটি ইঁদুর সেই কোম্পানীর পিয়ন। সিংহ প্রত্যেকদিন দুপুর বেলা লাঞ্চ করে তার এয়ার কন্ডিশন ঘরে চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা দিবা নিদ্রা দেয় এবং তখন কেউ তাকে বিরক্ত করে না।

একদিন সিংহ তার দৈনন্দিন দিবানিদ্রা দিচ্ছে তখন হঠাৎ করে একটা জরুরী ফাইলের দরকার পড়ল। নেংটি ইঁদুর পা টিপে টিপে সিংহের টেবিল থেকে ফাইলটি নিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ হাতে লেগে পানির গ্লাসটা নীচে পড়ে গিয়ে ঝন ঝন শব্দ করে ভেঙ্গে গেল। সিংহ সেই শব্দে চমকে জেগে উঠল। ইঁদুরকে দেখে খপ করে ধরে ফেলে হুংকার দিয়ে বলল, তোকে কতবার বলেছি ঘুমোনোর সময় শব্দ করবি না?

ইঁদুর কাচু মাচু হয়ে বলল, ভুল হয়ে গেছে স্যার।

ভুল? সিংহ গর্জন করে বলল, আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। তোর চাকরি যদি আমি এখন না খাই—তোকে আমি আস্ত গিলে খাব!

ইঁদুর হাত জোড় করে বলল, মাপ করে দেন স্যার। আর এই ভুল হবে না। ছেলে মেয়ের সংসার না খেতে পেয়ে মারা যাব।

তুই মারা গেলে আমার কি? সিংহ চোখ লাল করে বলল, তোর মত বেজন্মা অপদার্থ একটা নেংটি ইঁদুরের তো মরাই উচিৎ।

নেংটি ইঁদুর কাদো কাদো হয়ে বলল, ওরকম করে বলবেন না স্যার, কিছু বলা যায় না, এরকম তো হতেও পারে যে একদিন আপনাকে আমি বিপদ থেকে রক্ষা করব।

তুই বিপদ থেকে রক্ষা করবি আমাকে? সিংহ হঠাৎ হা হা করে হেসে উঠে বলল, তোর কথা শুনে আমি হেসে মরে যাই।

হাসতে হাসতে সিংহ বিষম খেয়ে যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি মনে করে সে নেংটি ইঁদুরকে ছেড়ে দিল।

বছরখানেক পর এন্টিকরাপশান অফিসারেরা জাল পেতেছে দুর্নীতি পরায়ন অফিসারদের ধরার জন্যে। আর সেই সঙ্গে ধরা পড়ল সিংহ। কঠিন জাল, আটকা পড়ে প্রাণপনে চিৎকার করছে সিংহ। সেই চিৎকার শুনে তার পিয়ন নেংটি ইদুর ছুটে এল। জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে স্যার?

দেখছিস না, এন্টি করাপশানের জালে আটকা পড়েছি।

নেংটি ইঁদুর জালটা ভাল করে পরীক্ষা করে বলল, শক্ত জালে আটকা পড়েছেন স্যার। এই যে ফাঁসটা আপনার ঘুষ খাওয়ার ফাঁস। এইটা আপনার বিদেশী ব্যাংকের একাউন্টের ফাঁস। এইটা অফিসের জিনিষপত্র নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের ফাঁস। এইটা স্ত্রীর নামে বেআইনীভাবে সম্পত্তি কেনার ফাঁস। এইটা তহবিল তসরুপের ফাঁস। এইটা...

কথা বন্ধ কর নেংটি ইঁদুর। পারলে আমাকে বাঁচা।

নেংটি ইদুর বলল, কঠিন সমস্যা, তবে দেখি চেষ্টা করে।

তখন সে তার ধারালো দাঁত দিয়ে কুট কুট করে ফাঁস কাটতে শুরু করল। একটা একটা করে সবগুলি ফাঁস কেটে দেয়ার পর সিংহ শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেল। ইঁদুর দাঁত বের করে হেসে বলল, বলেছিলাম না স্যার, ছোট বলে অবহেলা করতে হয় না! এত বড় বিপদ থেকে আপনাকে উদ্ধার করে দিলাম কিনা?

সিংহ মাথা নাড়ল, বলল, তা ঠিক। আয় কাছে আয়।

নেংটি ইঁদুর কাছে এগিয়ে গেল, ভাবল সিংহ নিশ্চয়ই এখন মোটা হাতে বখশীশ দেবে। কিন্তু ইঁদুর কাছে যেতেই সিংহ তাকে খপ করে মুঠোর মাঝে ধরে ফেলে বলল, তোকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে, না তুই আমার সব কথা জেনে গেছিস। তোকে ছেড়ে দিলে সব জানাজানি হয়ে যাবে!

এই বলে সিংহ কপ করে ইঁদুরকে গিলে ফেলল।

দুর্বচন: ভেবে চিন্তে মানুষের উপকার করতে হয়।

চাঁদ ও তার মা

সনাতন রূপ: চাঁদ একদিন তার মা'কে বলল তাকে একটা জামা করে দিতে যেটা তার গায়ে ঠিক করে লাগবে। চাঁদের মা বলল, কেমন করে তোমার জন্যে সেরকম জামা তৈরী করব? তুমি কখনো কখনো হও নূতন চাঁদ, তখন তুমি হও একবারে সরু, তারপর আবার কখনো হও পূর্নচন্দ্র, তখন তুমি এত বড়! আবার তার মাঝে তুমি বেশী বড়ও না আবার বেশী ছোটও না! তোমার জন্যে জামা তৈরী করা কি এতই সহজ?

সুবচন: অস্থিরমতি মানুষদের খুশী করা খুব কঠিন।

আধুনিক রূপ: চাঁদ একদিন তার মা'কে বলল, মা সবাই দেখ কি সুন্দর ফিটফাট কাপড় পরে। আর আমার গায়ে একটা সূতাও নাই, লজ্জায় মরে যাই। দাও না আমাকে একটা সুন্দর ফ্রক তৈরী করে।

চাঁদের মা মুখ ঝামটা মেরে বলল, সখ দেখে মরে যাই। তুই ফ্রক পরবি কি করে?

কেন সমস্যাটা কোথায়?

সমস্যাটা হচ্ছে যে তোর সাইজের কোন ঠিক নেই। প্রথমে নূতন চাঁদ হয়ে থাকিস ফিনফিনে সরু তখন যদি একটা ফিনফিনে সরু ফ্রক তৈরী করে দিই তাহলে দুদিনেই সেটা ছোট হয়ে যাবে। যদি পূর্ণিমার রাতের জন্যে বড় একটা জামা তৈরী করে দিই কয়দিনেই সেটা হয়ে যাবে ঢলঢলে। কোন সাইজের জামা দেব তোকে? তুই তো ক্রমাগত বড় হচ্ছিস আর ছোট হচ্ছিস।

চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, তুমি হাসালে মা—তোমার জ্ঞান বুদ্ধি দেখে লজ্জায় মরে যাই। কোন স্কুলে পড়াশোনা করেছ? বিজ্ঞান কিছু শেখায় নি তোমাদের ?

কেন কি হয়েছে?

তুমি জান না আমার আকার একটাই? সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাকে দেখা যায়। যখন এক পাশ থেকে অল্প আলো প্রতিফলিত হয় তখন আমাকে দেখা যায় সরু—যখন পুরোটা প্রতিফলিত হয় তখন আমাকে দেখায় বিশাল। আমার সাইজের তো কোন উনিশ বিশ হয় না।

চাঁদের মা খানিক্ষন সরু চোখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, তুই আমাকে বিজ্ঞান শিখাবি?

কেন সমস্যাটা কোথায়?

চাঁদের মা মাথা নেড়ে বলল, আরে গাধা, যদি বিজ্ঞানের কথাই বলিস তাহলে আমাকে বল দেখি চাঁদের আবার মা হয় কেমন করে? চাঁদ কি একটা কুকুরের ছানা নাকি বিড়ালের ছানা?

দুর্বচন: বিজ্ঞান নিয়ে বেশী মাথা ঘামানো ঠিক নয়।

শেয়াল এবং সিংহ

সনাতন রূপ: প্রথমবার যখন একটা শেয়াল বিশাল এক সিংহকে দেখতে পেল সে ভয়ে মৃত প্রায় হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বার যখন শেয়ালটি সিংহকে দেখতে পেল সে খুব ভয় পেল সত্যি কিন্তু অনেক কষ্টে নিজের ভয়টুকু লুকিয়ে রাখল। তৃতীয়বার যখন শেয়াল সিংহকে দেখতে পেল তখন আর এত ভয় পেল না, কাছে গিয়ে সিংহের সাথে এমনভাবে কথা বলতে লাগল যেন সে কতদিনের বন্ধু।

সুবচন: পরিচয় ভয়কে দুর করে।

আধুনিক রূপ: সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে ফিরে আসছে শেয়াল। রাস্তা জনমানবহীন, নির্জন। জায়গাটা ভাল নয়, চোর গুন্ডা মাস্তানদের নানা রকম উৎপাত। শেয়ালের একটু ভয় ভয় লাগতে থাকে। মোড় ঘুরতেই হঠাৎ দেখে পাহাড়ের মত কে জানি রাস্তা জুড়ে দাড়িয়ে আছে, চোখ জ্বলছে ভাটার মত, মাথায় লাল কেশর, বাতাসে উড়ছে। দেখে শেয়ালের কাপড় জামা নষ্ট হবার মত অবস্থা, কোন মতে চি চি করে বলল, কে? আপনি কে?

আমি সিংহ। তুই কে? এখানে কি করছিস?

আমি শেয়াল, সেকেন্ড শো সিনেমা দেখে ফিরছিলাম।

দূর হ ব্যাটা, এখান থেকে।

শেয়াল জান নিয়ে কোন মতে পালালো সেখান থেকে।

দ্বিতীয়বার শেয়ালের সাথে সিংহের দেখা হল একই জায়গায় সপ্তাহখানেক পরে। শেয়াল বন্ধুর বিয়ে খেয়ে ফিরে আসছিল, দেরী হয়ে গেছে বলে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে। গলির মোড়ে এসে সে একেবারে হকচকিয়ে যায়, রাস্তা জুড়ে দাড়িয়ে আছে সিংহ। ভারী গলায় বলল, কে যায়?

শেয়াল ক্ষীন স্বরে বলল, আমি শেয়াল। মনে নেই সেদিন দেখা হল সেকেন্ড শো সিনেমা দেখার পর?

এখানে কি করিস?

বিয়ে খেতে গিয়েছিলাম, দেরী হয়ে গেল।

ও।

শেয়াল পকেট থেকে সিগারেট বের করে ভয়ে ভয়ে বলল, খাবেন নাকি একটা?

কি সিগারেট? দেশী না বিদেশী?

বিদেশী।

দে দেখি একটা—

শেয়াল তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট বের করে ম্যাচ দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে দ্রুত পা চালিয়ে সরে পড়ল।

তৃতীয়বার শেয়ালের সাথে সিংহের দেখা হল দিন দশেক পরে। ট্রেনে ফিরছিল মফস্বল থেকে, যেটার পৌছানোর কথা সন্ধ্যে সাতটায় সেটা পৌছাল রাত বারটার সময়। রাস্তার মোড়ে আবার দেখা হয়ে গেল সিংহের সাথে। এবারে শেয়াল এত ঘাবড়ে গেল না, মুখে হাসি টেনে বলল, ভাল আছেন?

তুই ব্যাটা কে?

শেয়াল। মনে নেই, সেই যে সেদিন আপনাকে একটা সিগারেট খেতে দিলাম?

ও।

খাবেন নাকি আরেকটা সিগারেট?

দে দেখি।

শেয়াল সিগারেট বের করে দেয়, দুজনে দাড়িয়ে সিগারেট টানতে থাকে। শেয়াল আলাপ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে বলল, তা আপনি কয়দিন থেকে এই বিজনেস করছেন?

কোন বিজনেস?

এই বিজনেস। মাস্তানী! রোজগার পাতি কি রকম হয়?

কি বললি হারামজাদা? আমার সাথে রংবাজী?

সিংহ কোমর থেকে এক টানে একটা চাকু বের করে আনে, হ্যান্ডেলে চাপ দিতেই ক্যাড় ক্যাড় শব্দ করে চাকুর ফলা বের হয়ে আসে। শেয়ালের গলায় চাকু ধরে সিংহ মেঘ স্বরে বলল, খুন করে ফেলব তোকে—আজকে। লাশ ফেলে দেব—

শেয়াল ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে বলল, মাপ করে দেন—আর করব না, এই কান ধরছি—

সিংহ শেয়ালের চুলের ঝুটি ধরে পিছনে এত জোরে একটা লাথি দিল যে সে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল।

দুর্বচন: মাস্তানদের সাথে ঘনিষ্টতা করে লাভ নেই।

সনাতন রূপ: এক শীতের দিনে রোদ উঠেছে আর পিপড়ারা ছোটাছুটি করে সেই রোদে তাদের খাবার দাবার শুকিয়ে নিচ্ছে। কিছুদিন থেকে বৃষ্টি হয়ে তাদের খাবার দাবার ভিজে গিয়েছিল। এরকম সময়ে একটা গঙ্গা ফড়িং এসে হাজির, সে করুণ গলায় বলল, আমায় একটু খাবার দেবে? খিদেয় মারা যাচ্ছি।

পিপড়েরা বলল, গরমের সময় আমরা যখন আমাদের খাবার গুছিয়ে রাখছিলাম তখন তুমি কি করছিলে ?

ঘাস ফড়িং বলল, আমি গান গাইতে এত ব্যস্ত ছিলাম যে অন্য কিছুর সময়ই পাই নি।

পিপড়েরা বলল, গরমের সময় যদি গান গেয়েই কাটিয়ে থাক, এখন তাহলে খাবারের খোঁজে এসেছ কেন? এখন নেচে নেচেই কাটাও—

সুবচন: কখনো সুযোগ হাতছাড়া করতে হয় না।

আধুনিক: বেশ কিছু পিপড়া শান্তিনগরে একটা মেসে থাকে। এক ছুটির দিনে তারা হৈ চৈ করে রান্না করছে, ভুনা খিচুরী, মাছ ভাজা, মুরগীর রোষ্ট, আর সালাদ। রান্না বান্না প্রায় শেষের দিকে, হঠাৎ দরজায় শব্দ হল। পিপড়েদের একজন দরজা খুলে দেখে দেশের প্রখ্যাত গায়িকা ঘাস ফড়িং দাড়িয়ে আছে। পিপড়ে চোখ কপালে তুলে বলল, আপনি?

ঘাস ফড়িং হেসে বলল, হ্যাঁ, আমি। এত অবাক হচ্ছ কেন?

কি বলেন আপনি ? অবাক হব না মানে? কত বড় সৌভাগ্য আমাদের! পিপড়া চিৎকার করে অন্য সবাইকে ডেকে বলল, তোমরা দেখে যাও কে এসেছে—

সবাই ছুটে এসে দেখে ঘাস ফড়িং। তারা আনন্দে লাফালাফি করতে থাকে, একজন তার মাঝে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, আপা, কেন এসেছেন আপা? আমরা কি কিছু করতে পারি?

আর বল না, গলা সাধছিলাম, হঠাৎ গলা শুকিয়ে গেল, ফ্রীজ খুলে দেখি কোন কোল্ড ড্রিংক্স নেই। আবার দোকানে যাব? ভাবলাম দেখি তোমাদের কাছে আছে কি না।

অবশ্যিই আছে, অবশ্যিই আছে! আপনি বসেন আপা—

না বসব না। একটু তাড়া ছিল, বিকালে আরেকটা ফাংশান আছে। গলাটা কেমন জানি বসে আছে একটু সেধে নিতাম।

আপনাকে এখন যেতে দেব না আপা, আমাদের সাথে খাবেন।

না না সে কি বলছ?

না আপা, খেতেই হবে আমাদের সাথে। আপনি এত বড় গায়িকা, সারা দেশে এত নাম। আমাদের এত কাছে থাকেন, একটু সময় আপা আমাদের দিতেই হবে।

ঘাস ফড়িং একটু ইতস্ততঃ করে বলল, তা তোমরা যখন এত করে বলছ একটু বসেই যাই। আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না কিন্তু।

ঘাস ফড়িংকে পিপড়ারা সমাদর করে বসাল। গ্লাসে করে ঠান্ডা কোল্ড ড্রিংক দেয়া হল। সেখানে চুমুক দিতে দিতে ঘাস ফড়িং বলল, তোমাদের দিন কাল কেমন চলছে?

পিপড়াদের একজন নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আর আমাদের কথা বলে কি হবে? দশটা পাঁচটা অফিস করতে করতে জান শেষ। আপনার কথা বলেন—

ঘাস ফড়িং উদাস মুখে বলল, আমার কথা আর কি বলব। গান গেয়ে গেয়েই তো জীবনটা কেটে গেল। এখন ভাবছি অন্য একটা শিল্প মাধ্যম নিয়ে কাজ করে দেখি। নৃত্য—

পিপড়ারা একসাথে মাথা নেড়ে বলল, যা বলেছেন আপা! আপনার যা ফিগার, নাচে আপনাকে যা সুন্দর লাগবে!

দুর্বচন: বড় শিল্পীদের সবাই খাতির করে।

খরগোস ও ব্যাঙ

সনাতন রূপ: খরগোসেরা একদিন একসাথে বসে তারা যে কত দুর্বল সেটা নিয়ে বলাবলি করছিল। তারা বলছিল যে তাদের না আছে শক্তি না আছে সাহস। মানুষ পশুপাখী সবাই তাদের শত্রু সবাই তাদের ধরে ধরে খায়। খারগোসদের মনে হল তাদের এই যন্ত্রণা সহ্য করার থেকে মরে যাওয়া অনেক ভাল।

তাই একদিন খরগোসেরা পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করার জন্যে পুকুরের ধারে হাজির হল। সেই পুকুরের ধারে ছিল অনেকগুলি ব্যঙ, খরগোসের সাড়া পেয়ে সবাই লাফিয়ে পড়ল পানিতে।

তখন বুড়ো একটা খরগোস বলল, দাড়াও তোমরা—আগেই আত্মহত্যা করে বস না। এই যে দেখছ ব্যঙের দলকে, তারা আমাদের দেখে ভয় পায়। এরা নিশ্চয়ই আমাদের থেকেও দুর্বল!

সুবচন: একজন যত দুর্বলই হোক সবসময় আরেকজনকে পাওয়া যায় যে তার থেকেও দুর্বল।

আধুনিক রূপ: খরগোসেরা একদিন মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন কিছু শিকারী এসে হাজির। তারা বন্দুক দিয়ে গুলি করে কিছু খরগোসকে মেরে সেগুলি ধরে নিয়ে গেল। অন্যেরা কোন মতে পালিয়ে এসে এক জায়গায় একত্র হয়ে বলল, এই জীবন রেখে কোন লাভ নেই। যখন খুশী মানুষ এসে আমাদের মেরে ফেলছে, ধরে নিয়ে রোষ্ট করে খেয়ে ফেলছে, এভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ?

সব খরগোস মাথা নাড়ল। আরেকজন বলল, খাটি কথা! মানুষের ভয়ে ভয়ে বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই। চল আমরা পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে জীবন বিসর্জন দেই।

সবাই রাজী হল। হেঁটে হেঁটে তখন তারা পুকুর পাড়ে এসেছে। সেই পুকুর পাড়ে থাকত অনেক ব্যঙ, খরগোসের পায়ের তলায় চাপা খেয়ে চ্যাপটা হয়ে গেল কিন্তু ব্যঙ, অন্যেরা প্রানের ভয়ে ঝাপিয়ে পড়ল পানিতে।

বৃদ্ধ একটা খরগোস তখন বলল, দাড়াও, প্রাণনাশ করার আগে দেখ, এই যে ব্যঙ এরা আমাদের থেকেও দুর্বল। আমাদের থেকেও ভীতু। এরা যদি বেঁচে থাকতে পারে আমাদের বেঁচে থাকতে দোষ কি?

সব খরগোস মাথা নেড়ে বলল, তাই তো! খাটি কথা।

খরগোসের দল তখন খুশী মনে বনে ফিরে গেল।

এদিকে ব্যঙদের খুব মন খারাপ। তারা পুকুরের পানিতে ভেসে ভেসে জটলা করতে করতে বলল, এই তুচ্ছ জীবন রেখে কোন লাভ নেই। আমাদের না আছে শক্তি, না আছে সাহস না আছে মান সম্মান। কথা নেই বার্তা নেই কিছু খরগোস এসে আমাদের চিড়ে চ্যাপ্টা করে ফেলল!

অন্যেরা মাথা নেড়ে বলল, একেবারে খাটি কথা। এভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই।

আরেকটা ব্যাঙ বলল, চল জীবন বিসর্জন দিই। তখন অন্য সবাই তার পিছু পিছু রওনা দিল। ব্যাঙেরা যেই পুকুর পাড়ে লাফিয়ে উঠেছে তারা গিয়ে পড়ল এক দঙ্গল পোকা মাকড়ের উপর। পোকা মাকড়গুলি তখন আতংকে চিৎকার করে ছুটে পালাতে শুরু করে।

একটা বুড়ো ব্যাঙ আনন্দে চিৎকার করে বলল, আরে, এই পোকা মাকড়গুলি দেখি আমাদের থেকেও দুর্বল! খামাখা কেন দুর্বল ভেবে আমরা নিজেদের মেরে ফেলতে যাচ্ছি?

সবাই বলল, সত্যিই তো ! তখন সবগুলি ব্যাঙ মহা আনন্দে পোকা মাকড়গুলি ধরে ধরে খেতে শুরু করল।

যে সমস্ত পোকা মাকড় কোনভাবে ব্যাঙের কবল থেকে রক্ষা পেল তারা এসে একটা গাছের ডালে আশ্রয় নিল। পোকাগুলি লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এই জীবন রেখে কোন লাভ নেই। পদে পদে বিপদ, প্রাণের ঝুকি। তুচ্ছ যে ব্যাঙ তারাও পর্যন্ত যখন খুশী তখন আমাদের ধরে ধরে খায়।

অন্য পোকাগুলি বলল, খাটি কথা।

একটি মোটাসোটা মাকড়শা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, চল আত্মাহুতি দিই।

অন্য সবাই বলল, চল।

মাকড়শা বলল, কিন্তু দেব কেমন করে ?

একটা মাছি বলল, সেটা কোন সমস্যা না। ঐ দেখা যায় মানুষদের বাসা, সেখানে দল বেধে হাজির হয়ে একজন মানুষের ওপরে চড়াও হব। মানুষদের বাসায় সব সময় থাকে পোকা মাকড় মারার স্প্রে। তারা সেটা আমাদের উপর স্প্রে করে দেবে, ব্যস, আমরা মরে ভূত হয়ে যাব!

সব পোকারা তখন দল বেধে হাজির হল মানুষের বাসায়, সেখানে একটি মেয়ে সোফায় হেলান দিয়ে টেলিভিষনে নাটক দেখছে। পোকাগুলি তার উপর চড়াও হতেই মেয়েটা ভয়ংকর জোরে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে, মা গো! বাবা গো! কি বাজে রকমের পোকা ! কি সর্বনাশ!

মেয়েটা নিজের শরীর থেকে পোকা মাকড় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে করতে চিৎকার করে লাফাতে থাকে। তার চিৎকার শুনে অন্য সবাই ছুটে আসে এবং সবাই চিৎকার করতে থাকে।

তখন বুড়ো মত একটা ঘাস ফড়িং বলল, আরে এই মানুষেরা দেখি আমাদের থেকেও ভীতু—এরা আমাদের দেখেও ভয় পায়! তাহলে আমরা শুধু শুধু কেন মরতে যাব?

অন্য পোকারা বলল, সত্যিই তো!

তখন সব পোকা মাকড় আনন্দে হৈ হৈ করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে এল!

দুর্বচন: পোকা মাকড়কে সবাই ভয় পায়।

বুড়ো সিংহ

সনাতন রূপ: একটা সিংহ এত বুড়ো হয়েছে যে সে আর জন্তু জানোয়ার ধরে খেতে পারে না, কাজেই সে ঠিক করল সে বুদ্ধি খাটিয়ে শিকার ধরবে। সিংহটা একটা গুহায় আশ্রয় নিয়ে ভাণ করতে লাগল যে সে খুবই অসুস্থ। বনের পশু পাখীরা তাঁর খোঁজ নিতে যেই গুহায় ঢুকত সিংহ তাদের ঘাড় মটকে খেতো। এভাবে দিন কাটছে এমন সময় একদিন একটা শেয়াল এল খোঁজ নিতে। সে গুহার ভিতরে না ঢুকে বাইরে থেকে চিৎকার করে সিংহের খোঁজ খবর নিতে থাকে। সিংহ বলল, আমার শরীর খুবই অসুস্থ, কিন্তু তুমি বাইরে দাড়িয়ে আছ কেন? ভিতরে আস।

শেয়াল বলল, আমি আসতাম ঠিকই, কিন্তু তোমার গুহার সামনে সব জন্তু জানোয়ারদের পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। তারা শুধু ভিতরেই গেছে কেউ আর ফিরে আসে নি।

সুবচন: নিজের পর্যবেক্ষনই সবচেয়ে বড় সাক্ষী।

আধুনিক রূপ: একটা সিংহ এত বুড়ো হয়েছে যে আর দৌড়াদৌড়ি করে জন্তু জানোয়ার ধরে খেতে পারে না। দেখতে দেখতে সে শুকিয়ে গেল, পাঁজড়ের হাড় দেখা যায়, পেটে সব সময় খিদে বলে মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে থাকে। অনেক ভেবে চিন্তে সে একটা ফন্দী বের করল, মুখে রাখল লম্বা দাড়ি, মাথায় দিল টুপি, চোখে সুরমা, তুলার মাঝে আতর ভিজিয়ে কানে গুজে দিল তারপর লম্বা আলখেল্লা পরে একটা গুহার মাঝে আশ্রয় নিয়ে জিকির করতে শুরু করল।

কিছুদিনের মাঝেই চারিদিকে খবর ছড়িয়ে যায় যে গুহার মাঝে একজন মস্ত বড় পীরের আবির্ভাব হয়েছে এবং বনের পশুপাখীরা একে একে সেই গুহায় হাজির হতে শুরু করল। সিংহ তখন মনের আনন্দে তাদের ঘাড় ভেঙ্গে খেতে শুরু করল। দেখতে দেখতে সিংহের শরীর ভাল হয়ে মেদ জমে উঠতে শুরু করে।

বড় পীরের আবির্ভাব হয়েছে শুনে একদিন শেয়ালও তাকে দেখতে এল, সে গুহার বাইরে দাড়িয়ে দেখতে পেল জন্তু জানোয়ারের পায়ের ছাপ গুহার দিকে গিয়েছে কিন্তু কোন ছাপই গুহা থেকে বাইরে আসে নি। শেয়ালের খুব সন্দেহ হল, সে ভিতরে না ঢুকে বাইরে থেকেই চিৎকার করে বলল, হুজুরের শরীর এখন কেমন?

আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় ভাল। তুমি বাইরে কেন? ভিতরে এস।

আসার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি সব জন্তু জানোয়ারের পায়ের ছাপ ভিতরের দিকে গেছে, কিন্তু কোনটাই আর বাইরে ফেরৎ আসে নি। তার মানে তুমি আসলে পীর নও, তুমি মহা ধড়িবাজ ফন্দিবাজ, রক্তলোলুপ পশুখেকো প্রাণী। তুমি নিরীহ প্রানীদের ধোকা দিয়ে ভিভরে এনে তাদের ঘাড় মটকে খাও। আমি আজকেই বনের পশু পাখীকে তোমার কথা বলে দেব, তারপর দেখ, তোমার কি অবস্থা হয়!

সিংহ হা হা করে হেসে বলল, মূর্খ শেয়াল, আমার সাইনবোর্ড দেখ কি লেখা রয়েছে।

কি লেখা?

পড়ে দেখ।

শেয়াল পড়ল, সেখানে লেখা, হযরত সিংহে আলা গুলগুলিয়া কুনকী তাজিম দরদরিয়া গদ্দী নশীনের পবিত্র খানকায়ে শরীফ।

সিংহ বলল, দেখেছ?

দেখেছি।

তার মানে কি জান?

কি?

তার মানে আমি যখন খুশী যার ইচ্ছে তার ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খাব কেউ টু শব্দ করবে না। সবাই আরো বেশী বেশী করে আসবে, শুধু তাই না, একা না এসে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে আসবে! হা হা হা।

দুর্বচন: পীর ফকির থেকে সাবধান।

সনাতন রূপ: একটা ছেলে বাদামের বয়ামে হাত ঢুকিয়ে যতগুলি সম্ভব বাদাম মুঠি করে ধরল, কিন্তু যখন মুঠি ভরা বাদাম নিয়ে হাতটা বের করে আনতে গেল সে দেখল বয়ামের মুখটি ছোট এবং তার মুঠি ভরা হাত সেই ছোট মুখ দিয়ে বের হচ্ছে না।

ছেলেটা তার বাদামের লোভ সামলাতে পারছে না আবার হাতটা না বের করলেও না, এই দোটানায় পড়ে সে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে শুরু করল।

কাছে একজন দাড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। সে বলল, ছেলে, তুমি এত লোভী হয়েছ বলেই তো সমস্যা। যেটুকু আকড়ে ধরেছ তার অর্ধেক মুঠিতে ধরলেই তোমার হাত সহজে বের হয়ে আসত।

সুবচন: এক বারে বেশী অর্জন করার চেষ্টা ভাল নয়।

আধুনিক রূপ: মা নিউমার্কেট থেকে চানাচুর কিনে এনে রেখেছেন বয়ামে। তার ছোট ছেলের খুব চানাচুর খাবার সখ। মা তাকে বললেন, এখন চানাচুর খাস নে, খিদে নষ্ট হয়ে যাবে। বিকেল বেলা নাস্তা করার সময় খাবি।

ছেলে মাথা নেড়ে বলল, আচ্ছা।

কিন্তু মা চলে যাবার পর সে আর লোভ সামলাতে পারল না। এদিক সেদিক তাকিয়ে বয়ামে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে এক মুঠি চানাচুর নিয়ে হাতটা বের করতে গিয়ে টের পেল মুঠি বড় হয়ে যাওয়ায় হাত বের হচ্ছে না। ছেলেটা কি করবে বুঝতে পারছিল না, ঠিক তখন তার বড় ভাই এসে ঢুকল। ছোটভাইকে এভাবে হাতে নাতে ধরতে পেরে তার আনন্দ আর ধরে না, দাঁত বের করে হেসে বলল, চুরি করে চানাচুর খাচ্ছিস?

ছোট ভাই কোন কথা না বলে মুঠি ভরা হাতটা বের করার জন্যে হাত টানাটানি করতে থাকে।

বড় ভাই মাথা নেড়ে বলল, আরে গাধা, চুরি করে চানাচুরই যদি খাবি তাহলে কম করে খা। এত বেশী লোভ করিস বলেই তো ঝামেলা। যেটুকু ধরেছিস তার অর্ধেক যদি মুঠি করে ধরিস তাহলেই তো হাতটা বের হয়ে আসবে।

ছোট ছেলেটা হাতের মুঠি আলগা করে চানাচুর কমিয়ে মুঠি বের করে আনল। হাতের চানাচুর মুখে দেবার আগে বলল, আম্মাকে বলে দেবে না তো?

বড় ভাই চোখ মটকে বলল, বলতেও তো পারি!

প্লীজ, বল না।

তাহলে বল আমাকে তোর লাল স্টীকারটা দিবি।

ছোট ভাই মুখ কাচু মাচু করে বলল, লালটা না, ঐটা আমার সবচেয়ে প্রিয়। সবুজটা দিই?

না। বড় ভাই মুখ শক্ত করে বলল, আমার লালটাই চাই।

ছোট ভাই একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে লালটাই দেব, কিন্তু আম্মাকে যেন বলে দিও না।

ঠিক আছে এই বারে বলব না। কিন্তু আর এরকম যেন লোভ করিস না।

ছোট ভাই চলে যাবার পর বড় ভাই এদিক সেদিক তাকিয়ে বয়ামটা কাত করে হাতে চানাচুর ঢেলে নেয়। ছোট ভাই থেকে তার লোভ অনেক বেশী, বয়াম প্রায় আধা আধি খালি করে ফেলল!

দুর্বচন: পাজী বড় ভাইয়েরা শৈশব জীবনে দুষ্ট গ্রহের মত।

সনাতন রূপ: রোদের মাঝে একটা সাপ ঘুমিয়ে ছিল, একটা কাক তাকে দেখতে পেয়ে ভাবল সাপটা বুঝি মরে গেছে। কাকটা সাপটাকে পায়ে ধরে নিয়ে উড়ে চলল নিরিবিলি কোথাও বসে খাবার জন্যে।

এদিকে সাপটা ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠেই কাককে ছোবল দিতে শুরু করল। সাপটা ছিল বিষাক্ত, বিষের জ্বালায় মারা যেতে যেতে কাক বলল, হায়! আমি ভাবলাম বুঝি খাবার জন্যে আমি ভাল কিছু খুঁজে পেয়েছি, অথচ সেটাই কি না আমার প্রাণ নাশ করল!

সুবচন: বাইরে থেকে ভেতরের জটিলতা বোঝা যায় না।

আধুনিক রূপ: রোদের মাঝে একটা সাপ ঘুমিয়ে ছিল একটা কাক তাকে দেখতে পেয়ে ভাবল সাপটা বুঝি মরে পড়ে আছে। খাবারের আকাল যাচ্ছে, সাপ ব্যাঙ যাই পাওয়া যায় চোখ বন্ধ করে খেয়ে ফেলতে হয়। কাকটা তাই সাপটাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে উড়তে শুরু করল, বিলের কাছে একটা গাছে বসে আরাম করে খাওয়া যাবে।

এদিকে সাপটা জেগে উঠেছে। রেগে মেগে সে যেই কাককে ছোবল দেবে কাক হা হা করে বলল, আরে করছ কি? করছ কি?

কি আবার! তোকে ছোবল দিচ্ছি। বেজন্মা কোথাকার! বদমাইশী করার আর জায়গা পাস নি?

ছোবল দিচ্ছ মানে? কাক চোখ কপালে তুলে বলল, তুমি ছোবল দিলে কি আমি বেঁচে থাকব?

তোকে মারার জন্যেই তো আমি ছোবল দিচ্ছি।

কাক আরো অবাক হয়ে বলল, আমাকে মারার জন্যে?

নয়তো কি?

আমাকে মারলে তোমার কি অবস্থা হবে জান?

কি হবে?

কাক পাখা ঝাপটিয়ে উড়তে উড়তে বলল, ঐ নীচে তাকিয়ে দেখ।

সাপ নীচে তাকিয়ে বলল, কি দেখব?

মাটি থেকে কত ফুট উপরে আছি বলে মনে হয়? তিন শ ফুট তো বটেই। তিন শ ফুট উপরে থেকে যদি নীচে পড় তাহলে তুমি কত জোরে মাটিতে পড়বে জান?

সাপ লেজ দিয়ে মাথা চুলকে বলল, সেই কবে ফিজিক্স পড়েছি এখন কি মনে আছে?

কাক বলল, আমার মনে আছে। তুমি প্রায় আশী মাইল বেগে নীচে পড়বে। আশী মাইল বেগে যদি তোমাকে একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দেয় তোমার কি অবস্থা হবে জান? কেউ কি তারপর বেঁচে থাকবে?

সাপ কোন কথা বলল না।

কাক ঠোঁট ফাঁক করে হেসে বলল, কাজেই তুমি যদি এখন আমাকে ছোবল দাও আমি সাথে সাথে তোমাকে নীচে ছেড়ে দেব। তুমি নীচে পড়ে একেবারে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। আমি হয়তো তোমার বিষে মারা পড়ব কিন্তু তুমি বেঁচে থাকবে না।

সাপ তখনো কথা বলল না। কাক বলল, আর তুমি যদি ভাল মানুষের মত থাক তাহলে আমি তোমাকে বিলের ধারে নামিয়ে দিতে পারি।

সাপ ফোঁস করে বলল, সাপ কখনো ভাল মানুষের মত থাকে শুনেছিস ব্যাটা ছোটলোক? আমি মরি বাঁচি যাই হোক তোকে আমি শেষ করে ছাড়ব।

কাক উদাস স্বরে বলল, ঠিক আছে তোমার যা ইচ্ছে। তারপর সাপ ছোবল দেবার আগেই পায়ের মুঠি আলগা করল সাথে সাথে সাপ নীচে পড়তে থাকে।

তিন শ ফুট নীচে পড়ে মাটিতে আঘাত করার আগেই সাপের দাঁত কপাটি লেগে গিয়েছিল তাই মরার সময় সে বিশেষ কিছু টের পেল না। কাক নীচে নেমে এসে এবারে সত্যিকারের মরা সাপটাকে ধরে নিয়ে উড়ে চলল, বিলের ধারে গাছে বসে আরাম করে খাবে।

দুর্বচন: বিপদের সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়।

সনাতন রূপ: পিপড়ারা এক সময়ে ছিল মানুষ এবং তারা অন্য মানুষের মত চাষ আবাদ করত। কিন্তু তারা নিজেরা যে শষ্য আবাদ করত পিপড়েরা তাতে সন্তুষ্ট ছিল না। তাই তারা সব সময় লোভী চোখে অন্যদের শষ্য ফলমূল আবাদী জমির দিকে নজর রাখত। সুযোগ পেলেই তারা সেই সব শষ্য ফলমূল ফসল চুরি করে নিয়ে এসে নিজের গোলায় তুলে রাখত।

তাদের লোভ দেখে দেবরাজ জুপিটার একবার এত রেগে গেলেন যে তাদেরকে মানুষ থেকে পিপড়ায় পাল্টে দিলেন।

যদিও তাদের আকারের পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তাদের স্বভাবের কোন পরিবর্তন হল না। এখনো তারা অন্যের কষ্টের ফসল শস্য চুরি করে নিয়ে এসে নিজের ঘরে লুকিয়ে রাখে।

সুবচন: চোরকে শাস্তি দেয়া যায় কিন্তু তাতে তার স্বভাবের পরিবর্তন হয় না।

আধুনিক রূপ: এ দেশের রাজনৈতিক নেতারা আগে পিপড়া ছিল। তারা কখনো তাদের নিজের বিষয় সম্পত্তি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত না। তারা লোভী চোখে অন্য সবার ফসল ফলমূল আবাদী জমির দিকে তাকিয়ে থাকত। শুধু তাই নয়, সুযোগ পেলেই সেখান থেকে অন্যের পরিশ্রমে ফলানো ফসল শস্যকণা তুলে এনে নিজের ঘরে জমিয়ে রাখত।

পিপড়াদের এই লোভ দেখে ঈশ্বর খুব রাগ করে তাদের রাজনৈতিক দলের নেতা তৈরী করে দিলেন। রাজনৈতিক দলের নেতা হয়েও তাদের স্বভাবের কোন পরিবর্তন হল না। ক্ষমতায় যাওয়ার সাথে সাথে তারা অন্য মানুষদের সহায় সম্পত্তি দখল করে নিতে শুরু করে। অন্যের পরিশ্রমে অর্জ্জিত সম্পত্তিতে ভাগ বসায়, দেশের মানুষের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধে অন্যদের না দিয়ে নিজেদের মাঝে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়।

শুধু তাই নয় পিপড়ারা যেমন সাড়ি বেধে যায় তারাও এখনো ঠিক সেরকম সভা সমিতিতে যোগ দেয়ার জন্যে লোকজন জোগাড় করে বাস এবং ট্রাক নিয়ে সাড়ি বেধে যায়।

দুর্বচন: রাজনৈতিক নেতারা দেশের মানুষ থেকে নিজেদের আখের নিয়ে বেশী ব্যস্ত।

কাছিম এবং ঈগল পাখী

সনাতন রূপ: একটা কাছিম নিজের সাদামাটা জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঈগল পাখীকে অনুরোধ করল তাকে উড়তে শেখানোর জন্যে। ঈগল পাখী কাছিমকে বলল তার উড়তে শেখার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, ওড়ার জন্যে পাখার দরকার হয় এবং প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী তার কোন পাখা নেই। কাছিম তবু বার বার অনুনয় করতে থাকে উড়তে শেখানোর জন্যে, এমনকি তাকে নানারকম ধন দৌলত দেবে বলে লোভ দেখাল।

ঈগল পাখী শেষ পর্যন্ত একবার চেষ্টা করে দেখতে রাজী হল। সে তার থাবায় কাছিমকে ধরে আকাশে অনেক উচুতে নিয়ে ছেড়ে দিল। দুর্ভাগা কাছিম সেখান থেকে নীচে পাথরে পড়ে সাথে সাথে মারা পড়ল।

সুবচন: শক্ত মাটিতে দাড়িয়ে বেঁচে থাকাই ভাল।

আধুনিক রূপ: একটা কাছিমের খুব আকাশে উড়ার সখ। সে দিন রাত আকাশের দিকে তাকিয়ে পাখীদের উড়তে দেখে, কিভাবে সে উড়তে শিখবে বুঝতে না পেরে শেষ পর্যন্তএকটা কোচিং স্কুলে ভর্তি হল।

কোচিং স্কুলের শিক্ষক হচ্ছে ঈগল পাখী, সে কাছিমকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কোন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দেবে?

কাছিম বলল, আমি কোন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দেব না।

তাহলে তুমি এখানে এসেছ কেন?

আমি উড়তে শিখতে চাই।

তুমি উড়তে শিখবে? কিন্তু কাছিম তো কখনো উড়ে না। উড়ার কথাও না।

মানুষেরও তো আকাশে ওড়ার কথা না, কিন্তু মানুষ তো উড়ছে।

কিন্তু মানুষ উড়ছে প্লেনে, তুমি সেভাবে যদি উড়তে চাও প্লেনের টিকেট কেটে আকাশে উড়ো।

কাছিম মাথা নেড়ে বলল, না, আমি তোমাদের মত উড়তে চাই। প্লেনের ভিতরে বসে থাকলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে।

ঈগল পাখী মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু তুমি তো এমনিতে উড়তে পারবে না।

নিশ্চয়ই পারব, তুমি শুধু বলে দাও কি করতে হবে?

পাখা ঝাপটাতে হবে, কিন্তু তোমার পাখা কই?

কাছিম বলল, আমার এই পাগুলি ঝাপটাব, সেটাই হবে আমার পাখা। তুমি শুধু আমাকে আকাশে তুলে ছেড়ে দাও, দেখবে আমি উড়তে উড়তে নেমে আসব।

ঈগল পাখী ভুরু কুচকে বলল, উঁহু তুমি মারা পড়বে।

পড়ব না। প্লীজ আমাকে নিয়ে চল আকাশে, তোমার কোচিং স্কুলের দুই মাসের ফী আমি একবারে দিয়ে দেব।

দুই মাসের ফীয়ের কথা শুনে ঈগল পাখী একটু দুর্বল হয়ে পড়ল, সে তখন তার শক্ত থাবায় কাছিমকে ধরে আকাশে নিয়ে চলল, কাছিমের মুখে হাসি আর ধরে না। ঈগল পাখী কাছিমকে প্রায় মাইলখানেক উপরে তুলে ছেড়ে দিল। কাছিম প্রাণপনে তার ছোট ছোট পা গুলি নাড়তে থাকে কিন্তু কোন লাভ হল না। সে শক্ত ঢেলার মত নীচে পড়তে থাকল। সেই পায় এক মাইল উপর থেকে নীচে পড়ে কাছিম একেবারে থ্যাতলা হয়ে গেল, তাকে চেনার কোন উপায় রইল না।

প্রায় সাথে সাথেই পুলিশ এসে জায়গাটা ঘিরে ফেলল। মানুষজনের ভীড় জমে যায়, সাংবাদিকেরা ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে থাকে, আকাশ থেকে ঈগল পাখীও কাছিমের অবস্থা দেখার জন্যে নীচে নেমে এল। পুলিশ এসে ঈগল পাখীকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি কাছিমকে আকাশ থেকে ফেলেছেন?

আমি ফেলতে চাই নি, সে জোর করল।

সেটা নিয়ে কথা হচ্ছে না, আমি জিজ্ঞেস করেছি তাকে আকাশ থেকে ফেলেছেন কি না।

ঈগল মাথা চুলকে বলল, তা ফেলেছি।

পুলিশ অফিসারটি জিব দিয়ে চুক চুক শব্দ করে বলল, খুব ভুল করেছেন আপনি। নিরপরাধ কাছিমকে খুন করার জন্যে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।

ঈগল চোখ কপালে তুলে বলল, আমাকে? গ্রেপ্তা র? খুন করার জন্যে?

শুধু খুন না, আপনি আকাশ থেকে কাছিমকে ফেলে অন্যান্য মানুষদের জান মালের নিরাপত্তা নষ্ট করেছেন। মানুষের জীবনের হুমকি দিয়েছেন।

ঈগল পাখী কি একটা বলতে যাচ্ছিল তার আগেই পুলিশ তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল!

দুর্বচন: বেকুবের কথা শুনলে বড় বিপদ হয়।

সনাতন রূপ: একটা গাধা এবং একটা কুকুর একসাথে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ তারা একটা পুটুলী খুঁজে পেল। গাধা পুটুলীটা তুলে নিয়ে দেখে ভিতরে কিছু কাগজ। দেখা গেল সেখানে যব খড় আর বিচালী সম্পর্কে লেখা, গাধা উচ্চস্বরে সেটা পড়তে শুরু করে। কুকুর গাধার প্রিয় খাবারের বর্ণনা শুনতে শুনতে কিছুক্ষনের মাঝেই বিরক্ত হয়ে গিয়ে বলল, কয়টা পৃষ্ঠা উল্টে দেখো তো মাংশ এবং হাড় নিয়ে কিছু লেখা আছে কি না।

গাধা পৃষ্ঠাগুলি উল্টে দেখে বলল, না, মাংশ বা হাড় নিয়ে কিছু লেখা নেই।

কুকুর বিরক্ত হয়ে বলল, শুধু শুধু এই আজে বাজে কাগজগুলি পড়ছ কেন? ছুড়ে ফেলে দাও।

সুবচন: যার কাছে তার নিজের প্রয়োজন।

আধুনিক রূপ: এক গাধা হল কবি এবং কুকুর প্রবন্ধকার। দুজন বিকাল বেলা হাঁটতে বের হয়েছে, হঠাৎ দেখে রাস্তার পাশে একটা চকচকে ম্যাগাজিন পড়ে রয়েছে। গাধা ম্যাগজিনটা তুলে ভিতরে চোখ বুলিয়ে বলল, আরে, দেখ, ভিতরে আমার কবিতার বইটা নিয়ে লিখেছে।

কুকুর জিজ্ঞেস করল, কি লিখেছে?

গাধা গদ গদ হয়ে বলল, অনেক ভাল ভাল কথা লিখেছে। এই দেখ! আধুনিক কবির শব্দ যোজনা শৈল্পিক ব্যাঞ্জনার অপরূপ সুষমা মন্ডিত নান্দনিক রূপ...

কুকুর বাধা দিয়ে বলল, ভাষার উপরে আমার প্রবন্ধের বইটার উপরে কিছু লিখেছে না কি দেখ তো—

গাধা ম্যাগাজিনটা উল্টে পাল্টে বলল, না, সেরকম কিছু তো দেখছি না।

কুকুর বিরক্ত হয়ে বলল, না দেখে শুনে রাস্তা থেকে একটা বাজে ম্যাগাজিন তুলে নিলে! ময়লা না কি লেগে আছে, কে জানে। ফেলে দাও ডাষ্টবিনে—

দুর্বচন: নিজের প্রশংসা শুনতে বড়ই মধুর লাগে।

সনাতন রূপ: একদিন সব ষাঁড়েরা ঠিক করল তাদের নিয়মিত জবাই করার জন্যে তারা কশাইদের উপর প্রতিশোধ নেবে। যখন তারা পরিকল্পনা কাজে লাগানোর জন্যে তাদের শিং ঘষে ঘষে সুচাঁলো করছিল তখন একটা বুড়ো ষাঁড় বলল, আমি জানি, তোমাদের কশাইদের উপর রাগার কারণ আছে, কিন্তু আসলে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছে মাত্র। সত্যি কথা বলতে কি তারা আমাদের জবাই করার সময় চেষ্টা করে যেন আমরা বেশী ব্যথা না পাই। এখন তোমরা যদি সব কশাইদের মেরে ফেল, তখন যারা কশাইদের কাজ করতে আসবে তারা হবে অনভিজ্ঞ আমাদের ঠিক করে জবাই করতে পারবে না, শুধু শুধু আমরা বাড়তি কষ্ট পাব। আর যাই হোক না কেন, মানুষ কিন্তু কখনোই গরুর গোশত খাওয়া বন্ধ করবে না!

সুবচন: শত্রু পরিচিত হওয়াই শ্রেয়।

আধুনিক রূপ: একদিন সব গরুরা মিলে ঠিক করল তাদের জবাই করার অপরাধের শাস্তি দেবার জন্যে তারা সব কশাইদের মেরে ফেলবে। পরিকল্পনা কাজে লাগানোর জন্যে তারা একত্র হয়ে যখন শিং ঘষে ঘষে ধারালো করছিল তখন একজন বৃদ্ধ গরু বলল, আমার ধারণা কাজটা খুব ভাল হচ্ছে না।

কোন কাজটা?

এই যে তোমরা সব কশাইদের মেরে ফেলতে যাচ্ছ।

কেন এ কথা বলছ?

তোমরা কি ভেবেছ কশাইদের মেরে ফেললেই মানুষেরা গরুর মাংশ খাওয়া বন্ধ করে দেবে?

না, তা দেবে না।

সব কশাইদের যদি শেষ করে দিই, তখন নূতন কশাইয়েরা আমাদের জবাই করবে, তাদের না থাকবে অভিজ্ঞতা না থাকবে দক্ষতা। কে জানে হয়তো ভোঁতা চাকু দিয়ে উল্টো পাল্টা জায়গায় পোঁচ দিয়ে একটা বিতিকিচ্ছি কান্ড করে ফেলবে। আমরা উল্টো যন্ত্রণা পেয়ে মরব।

গরুরা চোখ লাল করে বলল, তুমি কি বলতে চাইছ?

বৃদ্ধ গরু বলল, আমার মনে হয়, কশাইদের উপর আমাদের প্রতিশোধ নেওয়া নেহায়েৎই বোকামী হবে। হাজার হোক তারা তো তাদের দায়িত্ব পালন করছে, কোন অন্যায় তো করছে না।

তাহলে আমরা করব কি?

মনে হয় আমাদের চেষ্টা করা উচিৎ যেন কশাইয়েরা আরো বেশী করে আমাদের জবাই করে।

বেশী করে জবাই করে?

হ্যাঁ, তাহলে মানুষেরা আরো বেশী করে গরুর গোশত খাবে। গরুর গোশতে রয়েছে হাই ক্লোরেষ্টল। সেটা খেয়ে তাদের আর্টারী আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে আসবে। তখন হার্ট এটাক হয়ে তারা মারা পড়বে।

গরুরা একটু অবাক হয়ে বৃদ্ধ গরুটির দিকে তাকিয়ে রইল। একজন বলল, এই যুক্তি মনে হয় আগেও শুনেছি। তাছাড়া তোমাকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আগে কোথায় যেন দেখেছি।

বৃদ্ধ গরু তার দাড়ি নাড়িয়ে বলল, সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। একাত্তরে আমি শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলাম।

দুর্বচন: গরু, গরুই থেকে যায়।

বাড়ীর ছাদে ছাগল

সনাতন রূপ: একটা ছাগল কি ভাবে কি ভাবে জানি একটা বাড়ীর ছাদে উঠে গিয়েছিল, যখন সে ছাদে ছাদে হাটাহাটি করছে তখন হঠাৎ দেখতে পেল একটা নেকড়ে বাঘ হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। যেহেতু নেকড়ে বাঘটা নীচে থেকে কিছুতেই ছাগলকে ধরতে পারবে না ছাগলটা তাকে নানা ভাবে উপহাস করতে শুরু করল।

নেকড়ে বাঘ উপরে তাকিয়ে বলল, তোমার ঠাট্টা তামাশা আমি ঠিকই শুনতে পাচ্ছি কিন্তু তোমার অনেক সাহস বলে তুমি সেটা করছ না। তুমি সেটা করছ তোমার নিরাপদ অবস্থানের জন্যে।

সুবচন: জীবনে অবস্থানের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী।

আধুনিক রূপ: একটা ছাগল কি ভাবে কি ভাবে জানি একটা বাড়ীর ছাদে উঠে গেছে। যখন সে ছাদে ইতস্ততঃ হাটাহাটি করছে তখন হঠাৎ দেখতে পেল একটা নেকড়ে বাঘ হেঁটে যাচ্ছে। ছাগল এতদিন নেকড়ে বাঘ দেখলেই ছুটে পালিয়ে গেছে, এখন এই ছাদে সে পুরোপুরি নিরাপদ, তাকে আর প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে না। ছাগলের মনে বড় আনন্দ হল। সে তখন চিৎকার করে নেকড়ে বাঘকে ডেকে বলল, এই ব্যাটা নেকড়ে, কই যাস?

নেকড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, আমাকে বলছ?

তোকে বলব না তো কাকে বলব? ব্যাটা ধড়িবাজ বদমাইস।

মুখ সামলে কথা বল, ছাগল।

কেন? তোকে আমি ভয় পাই নাকি? কুতকুতে জানোয়ার তোর মুখে আমি পেচ্ছাব করে দিই। কাছে আয় এই শিং দিয়ে আমি তোর ভূড়ি ফাঁসিয়ে দেব। এমন এক লাথি দেব যে তুই ছিটকে গিয়ে পড়বি খালে। জন্মের মত লুলা হয়ে যাবি।

নেকড়ে মুখ কাল করে বলল, আজে বাজে কথা বললে ভাল হবে না কিন্তু বলে রাখছি—

কেন ভাল হবে না? তুই আমাকে ধরবি? আয়! ধর! ছাগল অট্টহাসি দিয়ে দুই পা তুলে অঙ্গভঙ্গী করে নাচতে থাকে, লাফালাফি করতে থাকে, দাপা দাপি করতে থাকে। নেকড়েকে টিটকারী করে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে।

বাসার ভিতরে যারা ছিল তারা ছাদে লাফালাফির শব্দ শুনে বের হয়ে এসে দেখে একটা ছাগল। বাড়ীর মালিক বিরক্ত হয়ে একটা লাঠি নিয়ে ছাগলকে বেধরক মার লাগিয়ে ছাদ থেকে নামিয়ে দূর করে দিল।

নেকড়ে বাঘ কাছেই ছিল, কাছে এগিয়ে এসে বলল, কি রে ছাগল, এখন?

ছাগল দুই পা জোড় করে, অন্য পা কপালে ছুয়ে স্যালুট দিয়ে বলল, ঠাট্টা করছিলাম স্যার, বুঝতে পারেন নাই?

দুর্বচন: ছাগলের মত বুদ্ধি কারই কাম্য নয়।

সনাতন রূপ: একটা কুকুর একদিন রোদে শুয়ে আরাম করছিল, তখন হঠাৎ একটা নেকড়ে বাঘ এসে তার উপর হামলা করল। কুকুরটা তার জীবন ভিক্ষা করে বলল, নেকড়ে বাঘ, তুমি এখন আমাকে খেয়ো না। দেখতেই পাচ্ছ আমি এত শুকনো হাড় জির জিরে। আমার মালিক কয়দিনের মাঝেই একটা ভোজ দিচ্ছেন, তখন আমি খেয়ে মোটা সোটা নাদুস নুদুস হয়ে যাব, তুমি তখন আমাকে অনেক মজা করে খেতে পারবে।

নেকড়ে বাঘের প্রস্তাবটা বেশ পছন্দ হল, সে কুকুরকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। কয়দিন পর সে ফিরে এসে দেখে কুকুর বাড়ীর ছাদে বসে আছে। নেকড়ে তাকে ডেকে বলল, কুকুর, নেমে আস। মনে আছে, তুমি আমাকে কি কথা দিয়েছিলে?

কুকুর বলল, নেকড়ে, তুমি যদি আবার কোনদিন আমাকে ধরতে পার তাহলে আর বড় ভোজের জন্য অপেক্ষা কর না!

সুবচন: একবার ছ্যাকা খেলে পরেরবার সাবধান।

আধুনিক রূপ: একদিন একটা কুকুর রোদে শুয়েছিল। তখন হঠাৎ করে তার উপর একটা নেকড়ে বাঘ এসে হামলা করল। কুকুর চমকে জেগে উঠে নেকড়ে বাঘকে দেখে বলল, হুজুরে কেবলা, আপনি?

নেকড়ে বাঘ তার দাড়ি নেড়ে বলল, হ্যাঁ আমি।

কুকুর কদমবুসি করে বলল, হুজুর! আপনি কি মনে করে?

খিদে পেয়েছে, তোকে খাব।

কুকুর বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, আলহামদুলিল্লাহ! আমার কত বড় সৌভাগ্য! কোন দিক দিয়ে খাবেন? মাথার দিক দিয়ে না লেজের দিক দিয়ে? এমনি এমনি খেতে কি ভাল লাগবে? শরীরে উপর একটু নুনের ছিটে দিয়ে আসব?

নেকড়ে মাথা নেড়ে বলল, কিছু দরকার নেই।

কুকুর মুখ কাচুমাচু করে বলল, লজ্জায় মরে যাই হুজুর। আপনি আমাকে খাবেন কত বড় সৌভাগ্য। আগে জানলে ভাল মন্দ খেয়ে মোটা হয়ে থাকতাম। এখন আমার হাড্ডিসার শরীর কি হুজুরের ভাল লাগবে?

নেকড়ে বলল, কোন অসুবিধা নাই।

কুকুর ব্যস্ত হয়ে বলল, আমার সাহেব কয়দিনের মাঝে বড় খাওয়া দাওয়ার পার্টি দিচ্ছে, একটু যদি সময় দেন সেই খাওয়া দাওয়ার পর আমি মোটা নাদুস নুদুস হয়ে যেতে পারি হুজুর। তাহলে আপনার আমাকে খেতে কোন কষ্ট হবে না।

নেকড়ে লোভী চোখে কুকুরের দিকে তাকিয়ে বলল, সেটা কিন্তু তুই মন্দ বলিস নি!

তাহলে কি হুজুর কয়দিন পর আমাকে খেতে আসবেন?

নেকড়ে বলল, সেটাই ভাল, তুই খেয়ে দেয়ে একটু মোটা হয়ে থাকিস।

কুকুর বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, আপনার মুখের কথা আমার জন্যে হুকুম, জনাব।

কয়দিন পর নেকড়ে আবার এসে হাজির হল। ঘরের সামনে দাড়িয়ে হাক দিতেই কুকুর দৌড়ে এসে নেকড়ের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। পায়ে চুমু খেতে খেতে বলল, হুজুর আপনি এসেছেন?

হ্যাঁ। খাওয়া দাওয়া করেছিস ঠিক করে?

আপনার দোয়া। এই দেখেন কত মোটা হয়েছি। পেটে হাত দিয়ে দেখেন কত চর্বি।

নেকড়ে লোভী চোখে নাদুস নুদুস কুকুরকে দেখল, তার মুখে পানি এসে গেল সাথে সাথে। কুকুর জিজ্ঞেস করল, হুজুর কি এখনি খাবেন আমাকে?

হুম!

আলহামদুলিল্লাহ! এই দেখেন টমেটো সস মেখে এসেছি। দুইটা কাচা মরিচও নিয়ে এসেছি হুজুর।

নেকড়ে বাঘ কুকুরকে কামড়ে কামড়ে খেতে শুরু করল।

দুর্বচন: খাটি মুরিদেরা পীরের জন্যে জীবন দিতে দ্বিধা করে না।

সূর্য এবং ব্যাঙের অভিযোগ

সনাতন রূপ: একবার সূর্য বিয়ে করবে বলে ঠিক করল। ব্যাঙরা সেটা শুনে এত চেচামেচি করতে শুরু করল যে দেবরাজ জুপিটার জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপারটা কি?

ব্যাঙরা বলল, সূর্য একাই তার প্রচন্ড তাপে খালবিল নদী নালা শুকিয়ে আমাদের সর্বনাশ করে দেয়। সূর্য যদি এখন বিয়ে করে, তারপর যদি তার বাচ্চা কাচ্চা হয় তখন আমাদের অবস্থাটা কি হবে?

সুবচন: প্রকৃতি কখনো তার নিয়ম ভঙ্গ করে না।

আধুনিক রূপ: একবার ব্যাঙদের কাছে খবর এল যে সূর্য নাকি বিয়ে করতে যাচ্ছে। সেটা শুনে ব্যাঙদের মাঝে মহা আতংকের সৃষ্টি হল, তারা এত চেচামেচি শুরু করল যে দেবরাজ জুপিটার ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার খানা কি?

ব্যাঙরা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, সর্বনাশ হয়েছে দেবরাজ।

কি সর্বনাশ?

সূর্য বিয়ে করতে যাচ্ছে।

বিয়ে করতে যাচ্ছে?

জী। ব্যাঙেরা কাতর গলায় বলল, এক সূর্যের তাপেই আমাদের খালবিল নদী নালা শুকিয়ে যাচ্ছে, আমাদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। এখন যদি সে বিয়ে করে তারপর বাচ্চা কাচ্চা হয় তখন আমাদের কি অবস্থা হবে?

জুপিটার অট্টহাস্য করে বলল, দূর হও হতভাগারা। সূর্যের বিয়েটাই হবে কেমন করে আর বাচ্চাই হবে কেমন করে? সূর্য হচ্ছে একটা সাধারণ নক্ষত্র। তার ভিতরে হাইড্রোজেন গ্যাস থার্মো নিউক্লিয়ার রি-একশানে হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হচ্ছে। মহাকর্ষ বল দিয়ে সে সব গ্রহকে তাদের কক্ষপথে আটকে রেখেছে। ঔজ্জ্বল্য হচ্ছে চার দশমিক সাত, ভর হচ্ছে দুই হাজার বিলিওন বিলিওন বিলিওন কে জি...

দুর্বচন: বিজ্ঞান রূপকথার বারটা বাজিয়ে দেয়!

সনাতন রূপ: দুজন পথচারী প্রচন্ড রোদে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ একটা বট গাছ দেখতে পেয়ে তারা সেই গাছের নীচে ছায়ায় আশ্রয় নেয়। তারা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন উপরের দিকে তাকিয়ে একজন আরেকজনকে বলল, কি অপ্রয়োজনীয় একটা গাছ, না এর আছে কোন ফুল, না আছে কোন ফল! এর কাঠ পর্যন্ত কোন কাজে আসে না।

লোক দুজনের কথা শুনে বট গাছটা রেগে বলল, অকৃতজ্ঞের দল যখন কাঠ ফাটা রোদে আই ঢাই করছিলি তখন তো আমাকে দেখে ছুটে এসে আমার শীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছিস। এখন আমার পাতার ছায়ায় বসে আমাকে গালি গালাজ করছিস?

সুবচন: অনেকেই উপকারীর উপকার কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে না।

আধুনিক রূপ: দুজন পথচারী প্রচন্ড রোদে হাটতে হাটতে হঠাৎ একটা বট গাছ দেখতে পেয়ে খুব খুশী হয়ে উঠল। তারা গাছের ছায়া বসে বিশ্রাম নেয়, ঠান্ডা বাতাসে কিছুক্ষনেই তাদের শরীর জুড়িয়ে এল। গাছের ছায়ায় শুয়ে তখন তারা বটগাছটির সমালোচনা করতে শুরু করে। একজন বলল, দেখ গাছটাকে, কি বেহুদা একটা গাছ!

অন্যজন বলল, ঠিকই বলেছ, এত বড় একটা গাছ কিন্তু কোন কাজেই আসে না!

হ্যাঁ! এর না আছে ফুল, না আছে ফল! এর কাঠ দিয়ে ফার্নিচার দূরে থাকুক উনুনের লাকড়ী পর্যন্ত হয় না! এই গাছটার জন্ম হল কেন বল দেখি?

সত্যি বলেছ—

পথচারীদের কথা শুনে বট গাছ রেগে আগুন হয়ে গেল। সে তখন তার মাঝারী গোছের একটা ডাল ভেঙ্গে দুজনের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে তাদের মাজা ভেঙ্গে ফেলল।

দুর্বচন: রাগী বট গাছ থেকে সাবধান।

ঈগল ও তীর

সনাতন রূপ: একটা ঈগল পাখী একটা পাথরের উপরে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে দেখছিল। একজন শিকারী পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে থেকে ঈগলটাকে দেখতে পেয়ে তীর মেরে এফোড় ওফোড় করে ফেলল। যন্ত্রণায় কাতর শব্দ করতে করতে ঈগল পাখী তীরটার দিকে তাকিয়ে বলল, হায়! ভাগ্যের কি নিদারুন পরিহাস! যে তীর দিয়ে আমাকে মারা হল সেটার পিছনে ব্যবহার হয়েছে ঈগল পাখীর পালক!

সুবচন: নিজের কারণে যে দুর্ভাগ্যের সৃষ্টি হয় সেটি সবচেয়ে নিদারুন।

আধুনিক রূপ: একটা ঈগল পাখী একদিন একটা পাথরের উপরে বসেছিল। একজন শিকারী এসে ঈগল পাখীটাকে দেখে তার বন্দুক দিয়ে নিশানা করে সেটাকে গুলি করে মেরে ফেলল। মৃত্যুর আগে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সেটা বলল, হায়! ভাগ্যের কি পরিহাস! শিকারী আমাকে গুলী করল ঈগল মার্কা গুলি দিয়ে।

দুর্বচন: পাখী শিকারের জন্যে তীর থেকে বন্দুক বেশী কার্যকরী।

পিপড়া এবং ঘুঘু পাখী

সনাতন রূপ: একটা পিপড়া নদীর ধারে দাড়িয়ে পানি খাবার চেষ্টা করার সময় হঠাৎ পানিতে ভেসে গেল। কাছেই একটা গাছে একটা ঘুঘু পাখী বসেছিল, পিপড়াকে ডুবে যেতে দেখে সে গাছের একটা পাতা ছিড়ে নীচে ফেলে দিল। পিপড়া সেই পাতায় বসে তীরে এসে প্রাণ বাচাঁলো।

কয়দিন পরে একজন শিকারী ঘুঘু পাখীটাকে জালে ফেলে ধরার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ঠিক যেই মুহূর্তে সে জাল ফেলবে পিপড়া এসে কামড়ে দিল তার পায়ে। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে শিকারীর জাল পড়ল অন্য জায়গায় ঘুঘু প্রাণে বেঁচে গেল।

সুবচন: একটি ভাল কাজের প্রতিদান হয় আরেকটি ভাল কাজ দিয়ে।

আধুনিক রূপ: একটা ঘুঘু পাখী একদিন গাছে বসে তার শর্টওয়েভ রেডিওতে বি.বি সি.র খবর শুনছে হঠাৎ সে নীচে নদীর পানিতে একটা আলোড়ন দেখতে পেল। সে তার বাইনোকুলারটি হাতে নিয়ে চোখে লাগিয়ে দেখে একটা পিপড়া পানিতে খাবি খাচ্ছে।

ঘুঘু পাখীটা তার সেলুলার ফোন দিয়ে তার সহকারীকে ফোন করল সাথে সাথে। সহকারী উদ্বিগ্ন গলায় বলল, কি হয়েছে স্যার? কোন সমস্যা ?

না, ঠিক সমস্যা নয়। আমি নদীর দিকে তাকিয়ে ছিলাম, হঠাৎ মনে হল একটা পিপড়া ভেসে যাচ্ছে।

পিপড়া ?

হ্যাঁ, তুমি কি একটা লাইফ জ্যাকেট পৌছে দিতে পারবে?

লাইফ জ্যাকেট? একটা পিপড়ার জন্যে?

ঘুঘু বলল, আহা! ক্ষতি কি, পিপড়া বলে কি তার জীবনের কোন মূল্য নেই?

ঠিক আছে স্যার, আপনি যখন বলছেন।

কিছুক্ষণের মাঝেই একটা লাইফ জ্যাকেট দিয়ে পিপড়াকে উদ্ধার করে আনা হল। নদীর তীরে একটা এম্বুলেন্স দাড়িয়ে ছিল সেটাতে করে পিপড়াকে সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। দেখা গেল অবস্থা গুরুতর নয়, বিকেল বেলা ছেড়ে দেয়া হল তাকে।

কয়দিন পরে একটা শিকারী এসেছে বনে। ঘুঘু দেখতে পেয়ে সে তার রাইফেল তাক করেছে ঘুঘুর দিকে। ঠিক তখন পিপড়াও যাচ্ছে সেই পথ দিয়ে, শিকারীকে দেখে তার রক্ত হিম হয়ে গেল, যে ঘুঘু তার প্রাণ রক্ষা করেছে সেই ঘুঘুকে মেরে ফেলার জন্যে শিকারী রাইফেল নিশানা করেছে?

পিপড়া বুঝতে পারল তার হাতে কোন সময় নেই। যেভাবে হোক তার ঘুঘুকে রক্ষা করতে হবে। সে ছুটে গেল তার বাসায়, বাইরে মোটর সাইকেলটি দাড়া করানো ছিল, লাফিয়ে চেপে বসল সেখানে। ষ্টার্ট করে সে ছুটে চলল শিকারীর দিকে। মোটর সাইকেলের গতি সে বাড়িয়ে চলল দ্রুত। দূরে শিকারী দাড়িয়ে আছে, ট্রিগারে আংগুল চলে গেছে, যে কোন মুহূর্তে গুলি করে দেবে। সময় নেই এক মুহূর্ত—পিপড়া প্রচন্ড বেগে তার মোটর সাইকেল নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল শিকারীর পায়ে, সেই মুহূর্তে গুলি করল শিকারী!

পায়ে খোচা খেয়ে চমকে উঠে শিকারীর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, ঘুঘু বেঁচে গেল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। পরদিন রেডিও টেলিভিষনে সেই খবর প্রচারিত হল ফলাও করে। খবরের কাগজে সাক্ষাৎকার বের হল পিপড়ার, রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল সে। রাস্তায় বের হলে তার অটোগ্রাফের জন্যে ভীড় করে আসে লোকজন।

দুর্বচন: খ্যাতির অনেক বিড়ম্বনা।

শেয়াল ও সারস

সনাতন রূপ: শেয়াল একবার সারসকে খেতে ডেকেছে। সারস খেতে এলে শেয়াল তাকে একটা থালায় করে খানিকটা স্যুপ খেতে দিল। চ্যাপটা থালা থেকে চেটে চেটে স্যুপ খেতে শেয়ালের কোন অসুবিধে হল না কিন্তু সারসের হল খুব মুশকিল। সে কিছুতেই তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে সেই থালা থেকে স্যুপ খেতে পারল না। সারসের এই দুর্গতি দেখে শেয়ালের আনন্দ আর ধরে না!

কিছুদিনের মাঝেই সারস শেয়ালকে খেতে ডাকল। খেতে গিয়ে শেয়াল দেখে সারস তার খাবার দিয়েছে লম্বা এবং সরু মুখের একটা কুজোর ভিতরে। সারস যখন তার লম্বা ঠোঁট ঢুকিয়ে খাবার খাচ্ছিল তখন শেয়াল ক্ষুধার্ত হয়ে সেখানে বসে রইল।

সুবচন: ঢিল মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

আধুনিক রূপ: শেয়াল একবার সারসকে খেতে ডেকেছে, সারস খেতে গিয়ে দেখে শেয়াল খেতে দিয়েছে একটা থালায়। শেয়াল সেই থালা থেকে চেটে চেটে মহানন্দে খেতে খেতে সারসকে বলল, কি হল সারস? খাচ্ছ না কেন? রান্না ভাল হয় নি বুঝি?

সারস খানিক্ষন তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, রান্না মনে হয় ভালই হয়েছে কিন্তু লম্বা ঠোঁট দিয়ে খেতে পারছি না যে!

শেয়াল হা হা করে হেসে বলল, তোমরা পাখীরা সত্যিই হাস্যকর এক ধরনের প্রাণী। এরকম লম্বা ঠোঁট কি কাজে লাগে বল? সাধারণ খাবার জিনিষই খেতে পার না, তাহলে এই ঠোঁট দিয়ে কি হবে?

ক্ষুধার্ত সারস খুব চটে মটে বাড়ী ফিরে এল। পরের সপ্তাহেই সে শেয়ালকে খেতে ডেকেছে, শেয়াল এসে দেখে খাবার দেয়া হয়েছে লম্বা গলার একটা কুজোয়। সারস তার ঠোঁট ঢুকিয়ে খেতে খেতে বলল, শেয়াল ভায়া লজ্জা কর না, নিজের বাড়ীর মত মনে করে খাও।

শেয়াল খানিক্ষন সেই কুঁজোয় মুখ ঢোকানোর চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল। সারস হা হা করে হেসে বলল, কি হল? রান্না ভাল হয় নি নাকি?

শেয়াল কিছু বলল না। সারস বলল, তোমাদের ঐ মুখ দাঁত জিব মনে হয় কোন কাজেই আসে না।

শেয়াল চোখ লাল করে বলল, মুখ দাঁত চোখ কি কাজে আসে দেখতে চাও? এই দেখ—

এই বলে সে লাফিয়ে সারসের ঘাড় কামড়ে ধরে মট করে সেটা ভেঙ্গে তাকে দিয়ে রাতের খাবার সেরে নিল।

দুর্বচন: ঢিল খেলে পাটকেলটিও খেতে হয়।

পশু পাখী এবং বাদুর

সনাতন রূপ: পশু এবং পাখীদের মাঝে অনেকদিন থেকে যুদ্ধ চলছিল। এমনিতে বাদুর এই যুদ্ধ থেকে দূরে দূরে থাকত কিন্তু যুদ্ধে যখন পাখীরা ভাল করতে শুরু করত তখন সে পাখীদের দলে যোগ দিয়ে তাদের হয়ে যুদ্ধ করত। আবার যুদ্ধে যখন পশুরা ভাল করতে শুরু করত তখন দেখা যেত বাদুর পশুদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ করছে।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কেউই বাদুরের দিকে বেশী নজর দেয় নি কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার পর পশু এবং পাখী দুই দলই এই দুই মুখী বিশ্বাসঘাতকের সাথে কোন সম্পর্ক রাখল না। সেই থেকে বাদুর পশু এবং পাখী দুই সমাজেরই অপাংক্তেয় হয়ে রইল।

সুবচন: দুই নৌকায় পা রাখা ঠিক নয়।

আধুনিক রূপ: পাখীরা যখন দেশের ক্ষমতায় ছিল বাদুরের তখন পাখীদের সাথে বিশেষ দহরম মহরম ছিল। খবরের কাগজে সাক্ষাৎকার দিয়ে, সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে একাধিকবার সে বলেছে, আমি পাখী ছাড়া অন্য কিছু নই। আমার দেহে পাখীর রক্ত, আমার চিন্তা ভাবনা মানসিকতা পাখীদের মত, আমার রাজনৈতিক আদর্শ পাখীদের। আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন পাখীদের সাথে হাতে হাত কাঁধে কাঁধ এবং পাখায় পাখা মিলিয়ে থাকব।

বলাবাহুল্য বাদুরকে তার বিশ্বস্ততার জন্যে পাখীরা খুব পছন্দ করত এবং তার বিশ্বস্ততার পুরস্কার হিসেবে তাকে "ঘাসের বিচি" মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী তৈরী করে দিয়েছিল।

তখন দেশে নানারকম গোলমাল চলছিল এবং একদিন হঠাৎ করে মিলিটারী অভ্যুত্থান করে পশুরা ক্ষমতায় চলে এল। পশুদের একজন জেনারেল ক্ষমতায় গিয়েই জরুরী আইনজারী করে জাতীয় পরিষদ বাতিল করে দিল।

দুদিন না যেতেই দেখা গেল বাদুর খবরের কাগজে বিশাল বিবৃতি দিয়েছে। সেখানে বলেছে, আমি আসলে একজন পশু। আমি আকাশে উড়তে পারি সত্যি কিন্তু আমি পাখী নই, পাখীদের মত আমার পাখা নেই। একটা পাতলা আবরন আমার শরীরে লাগানো আছে। সেটা ব্যবহার করে আমি উড়ি। পাখীরা ডিম দেয় কিন্তু আমি বাচ্চা প্রসব করি। পাখী প্রজাতির ঠোট আছে কিন্তু আমার আছে মুখ দাঁত আর জিহ্বা। আমি শতকরা একশ ভাগ পশু। পাখীর সাথে

আমার কোন সম্পর্ক নেই। দুষ্ট লোকেরা আমাকে পাখীর সাথে তুলনা করে থাকে কিন্তু প্রকৃত সম্পর্ক আমার পশুর সাথে। পশুর সাথে আমার সম্পর্ক জৈবিক এবং আত্মিক!

পশু মিলিটারী জেনারেলরা খুব খুশী হয়ে বাদুরকে "বন্দুকের নল পরিষ্কার" মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা করে দিল। তার জন্যে একটা গাড়ী আর ফ্রী টেলিফোন দেয়া হল।

বছর কয়েক পর দেশে বিশাল গণ অভ্যুত্থান হয়ে সামরিক শাসন শেষ হয়ে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার তৈরী হয়েছে। পশু এবং পাখী দুই সম্প্রদায় মিলেই সরকার গঠন করেছে। তখন আবার বাদুর এসে হাজির হল। সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে মুখে হাসি টেনে বলল, আমি একই সাথে পশু এবং পাখী! আমি পশুর মত বাচ্চা প্রসব করি আবার পাখীর মত আকাশে উড়ি। আমার রয়েছে পশুদের নৈতিকতা এবং পাখীদের নিয়মানুবর্তিতা। আমার রয়েছে পশুদের শক্তি এবং পাখীদের শৃঙ্খলা। আমার মাঝে আছে পশুদের সৌন্দর্য্য এবং পাখীদের ভালবাসা। পশু এবং পাখী এই দুই সম্প্রদায়ের আমি হচ্ছি একমাত্র যোগসূত্র। আমার মাঝে দিয়েই সৃষ্টি হবে সম্প্রীতি আর সহনশীলতা।

পশু এবং পাখী দুই দলই বলল, সাধু! সাধু! সাধু! বাদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ তাকে তারা যমুনা ব্রীজের ঠিকাদারী দিয়ে দিল।

দুর্বচন: এক সাথে দুই নৌকায় পা রাখতে পারে কৌশলী প্রাণী।

দুই প্রেমিকা

সনাতন রূপ: একজন মানুষের দুজন প্রেমিকা ছিল, একজন একটু বয়স্কা অন্যজন তরুণী। মানুষটি নিজে ছিল মধ্য বয়স্ক এবং তার চুল ছিল আধ পাকা। সে যখন তার বয়স্কা প্রেমিকার কাছে যেত সে বেছে বেছে তার কাল চুলগুলি তুলে ফেলত যেন তাকে আরো বেশী বয়স্ক দেখায়। আবার সে যখন তার তরুণী প্রেমিকার কাছে যেত সে টেনে টেনে তার পাকা চুলগুলি তুলে ফেলত যেন তাকে কমবয়সী দেখায়।

দুজনে মিলে ধীরে ধীরে তার মাথার সব চুল তুলে ফেলল, এবং এক সময় তার মাথায় আর একটা চুলও রইল না।

সুবচন: যে অন্যের কাছে নিজেকে পুরোপুরি বিকিয়ে দেয় তার নিজের বলে কিছু থাকে না।

আধুনিক রূপ: একজন মানুষের দুজন প্রেমিকা। একজন একটু বয়স্কা অন্যজন তরুণী। মানুষটি নিজে মধ্যবয়স্ক, চুল আধপাকা। সে যখন তার বয়স্কা প্রেমিকার কাছে যেত সে পার অক্সাইড দিয়ে ধুয়ে তার মাথার চুল পুরোপুরি সাদা করে ফেলত। তাকে দেখাত থুরথুরে বুড়োর মত। আবার সে যখন তার কমবয়সী প্রেমিকার কাছে যেত সে লোকটার চুলে কলপ দিয়ে তার চুল কুচকুচে কাল করে ফেলত, তখন তাকে দেখাত একজন কমবয়সী মানুষের মত। তার পরিচিত যারা ছিল তারা ভারী অবাক হত তাকে দেখে, কারণ, একদিন হয়তো তার মাথায় ছিল ধবধবে সাদা চুল পরদিনই সেটা কুচকুচে কাল। তার পরদিন আবার ধবধবে সাদা!

মাথায় ঘনঘন পার অক্সাইড এবং কলপ দেয়ার সেখানে জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া হয়ে একদিন তার চাঁদিতে ক্যান্সার হয়ে লোকটা মারা পড়ল।

দুর্বচন: রাসায়নিক দ্রব্য সতর্ক হয়ে ব্যবহার করতে হয়।

সনাতন রূপ: গ্রীষ্মের এক তাপ দগ্ধ দিনে একটা সিংহ এবং একটা বুনো শূকর একই সাথে পানির একটা ছোট স্রোত ধারার কাছে হাজির হল। কে আগে পানি খাবে সেটা নিয়ে সাথে সাথে তারা ঝগড়া ঝাটি শুরু করে দেয়। কিছুক্ষণের মাঝেই সেই ঝগড়াঝাটি মারামারিতে পাল্টে গেল এবং তারা একে অন্যকে আক্রমন করতে শুরু করল। দীর্ঘ সময় নিজেদের মাঝে কামড়াকামড়ি করে তারা ক্লান্ত হয়ে একটু নিঃশ্বাস নিচ্ছিল হঠাৎ দেখে তাদের ঘিরে আকাশে কয়েকটা শকুন উড়ছে, তাদের দুজনের মাঝে যে আগে মারা যাবে তাকে খাওয়ার জন্যে।

শকুনকে দেখে সিংহ এবং বুনো শূকর দুজনেরই শুভ বুদ্ধির উদয় হল, তারা বলল, শকুনের খাবার হওয়ার থেকে মিলে মিশে থাকা অনেক ভাল।

সুবচন: বন্ধুত্ব বিপদ থেকে রক্ষা করে।

আধুনিক রূপ: গ্রীষ্মের এক তাপ দগ্ধ দিনে একটা সিংহ এবং একটা বুনো শূকর একই সাথে পানির একটা স্রোত ধারার কাছে হাজির হল। কে আগে পানি খাবে সেটা নিয়ে সাথে সাথে ঝগড়া শুরু হয়ে যায়, সিংহ হুংকার দিয়ে বলল, আমার রাস্তা থেকে সরে যা, পানি খেতে দে আমাকে।

বুনো শূকর তার দাঁত উঁচু করে বলল, আমি সরে যাব? তোর সাহস তো কম নয়। তুই সরে যা—

সিংহ মুখ খিচিয়ে বলল, এত বড় কথা? একটা দাবড়ানি দেব যে তুই ছিটকে গিয়ে পড়বি ঐ ধারে।

বুনো শূকর কাছে এগিয়ে এসে বলল, ঠিক আছে, সাহস থাকলে দে। তোর বাপের নাম যদি না আজ আমি ভুলিয়ে দিই!

সিংহ তখন বুনো শূকরের উপর ঝাপিয়ে পড়ল, সাথে সাথে দুজনের মাঝে ভয়ংকর মারা মারি শুরু হয়ে যায়। সিংহ বুনো শূকরের ঘাড় কামড়ে ধরে বুনো শূকর তার দাঁত দিয়ে সিংহের পেটে আঘাত করতে থাকে, একজন আরেকজনের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে, একে অন্যকে কামড়ে খামচে একটা বিতিকিচ্ছি অবস্থার সৃষ্টি করে। তাদের গর্জন, চিৎকার, হুংকার আস্ফালন আর গালি গালাজের শব্দে তাদের ঘিরে অন্যান্য পশুদের ভীড় জমে যায়। কিছুক্ষনের মাঝেই আকাশে

উল্লাসিত কিছু শকুনকে দেখা গেল তারা সিংহ আর বুনো শূকরকে ঘিরে ঘুরতে ঘুরতে নীচে নেমে আসতে থাকে।

এদিকে সিংহ আর বুনো শূকর মারামারি করতে করতে একটু ক্লান্ত হয়ে এসেছে। খানিক্ষন জিরিয়ে নেবার জন্যে একজন আরেকজনকে ধরে জাপটে ধরে নিঃশ্বাস দিতে থাকে। হঠাৎ সিংহ আকাশের দিকে তাকিয়ে শকুনকে দেখতে পায়, সে অবাক হয়ে বলল, ওগুলি কি? শকুন নাকি?

বুনো শূকর চোখ ছোট ছোট করে তাকিয়ে বলল, তাই তো মনে হয়!

শকুন কেন? আশে পাশে তো কোন মরা প্রাণী নেই।

বুনো শূকর নাক দিয়ে শব্দ করে বলল, আর বেকুব কিছুক্ষনের মাঝেই দেখবে। আমি যখন তোকে মেরে ফেলব তুই হবি সেই মরা প্রাণী।

সিংহ অবাক হয়ে বলল, তার মানে এরা আমাদের একজনের মরার জন্যে অপেক্ষা করছে?

তা নয়তো কি? শকুনের কাজই তো তাই।

সিংহ বুনো শূকরকে ছেড়ে দিয়ে বলল, শকুনের খাবার হওয়ার জন্যে তো নিজেদের মাঝে মারামারি করে মরে যাবার কোন মানে হয় না!

বুনো শূকরও রাজী হল, বলল, কোন মানে হয় না।

তাহলে চল পানি খেয়ে আমরা চলে যাই।

হ্যাঁ, আমি আগে তারপর তুই।

সিংহ রেগে বলল, কেন আগে যাবি? তুই জানিস আমার কত খান্দানী বংশ?

খান্দানী না ছাই! তুই জানিস আমার পূর্ব পুরুষ এসেছে তুরস্ক থেকে?

তোর তুরস্কে আমি পেশাব করে দিই, সিংহ হুংকার দিয়ে বলল, আমার থেকে খান্দানী এখানে কেউ নেই। আমার পূর্ব পুরুষেরা এসেছে একেবারে সৌদী আরব থেকে। খোঁজ খবর নিলে দেখবি সৌদী রাজা আমার চাচাতো ভাই।

তোর চাচাতো ভাই গোল্লায় যাক—

এত বড় কথা? দুজনে আবার মারামারি শুরু করল। ঘন্টা খানেকের মাঝে দুজনেই নেতিয়ে পড়ে। শকুনেরা তখন আকাশ থেকে নীচে নেমে এল। তারা যখন তাদের মহাভোজ শুরু করেছে তখনো সিংহের খান্দানী বুক একটু ধুক ধুক করছিল।

দুর্বচন: খান্দানী বংশের মান রক্ষার জন্যে প্রাণ দেয়া বিচিত্র কিছু নয়।

গাধা এবং তার ছায়া

সনাতন রূপ: একজন মানুষ একদিন কোন এক জায়গায় যাওয়ার জন্যে একদিন একটা গাধা ভাড়া করল। মানুষটি যখন তার যাত্রা শুরু করেছে তখন তার সাথে গাধার মালিকও গাধাটিকে হাটিয়ে নেয়ার জন্যে রওনা দিয়েছে। সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল, প্রচন্ড রোদে হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে এক সময় দুজনেই থেমেছে। যে মানুষটি গাধা ভাড়া করেছে সে যখন গাধার ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম নিতে চাইল গাধার মালিক তখন নিজে ছায়াতে বসার জন্যে বলল, সে গাধা ভাড়া দিয়েছে সত্যি কিন্তু তার ছায়া ভাড়া দেয় নি। যে গাধাটি ভাড়া নিয়েছে সে বলল, যখন সে গাধাটি ভাড়া নিয়েছে তখন গাধার সবকিছুতেই তার অধিকার।

কথা কাটাকাটি দিয়ে শুরু করে কিছুক্ষনেই হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। দুজন যখন হাতাহাতি করছে তখন হঠাৎ দেখা গেল গাধা ছুটে পালিয়ে গেছে।

সুবচন: ধুরন্ধর ব্যাবসায়ীরা যে কোন পরিবেশ থেকেই খানিকটা মুনাফা করে নিতে পারে।

আধুনিক রূপ: গাধা ভাড়া দেয়া খুব রমরমা ব্যাবসা, দেশে গাধা ভাড়া দেয়ার অনেক রকম এজেন্সী খোলা হয়েছে। একজন মানুষ সেরকম একটা এজেন্সী থেকে একটা গাধা ভাড়া নিতে গিয়েছে। ভাড়া নেয়ার আগে নানারকম কাজগপত্র সই করতে হয় মোটা টাকা আমানত দিতে হয় এবং শেষ পত্র জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্পে সই করে কন্ট্রাক্ট তৈরী করতে হয়। সব রকম কাজকর্ম শেষ করে শেষ পর্যন্ত সে গাধা ভাড়া নিয়ে এসেছে।

লোকটা গাধার উপর সব জিনিসপত্র চাপিয়ে রওনা দিয়েছে। সাথে এজেন্সীর একজন লোক মাইক্রোবাসে করে যাচ্ছে গাধার উপর চোখ রাখার জন্যে।

তখন গ্রীষ্মকাল, দেখতে দেখতে রোদ তেতে উঠল। গরমে ঘামতে ঘামতে লোকটি হাঁশফাস করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে লোকটি গাধাটিকে থামিয়ে তার ছায়ায় বসল বিশ্রাম নেবার জন্যে। সাথে সাথে এজেন্সীর লোকটা মাইক্রোবাস থামিয়ে নীচে নেমে এল। বলল, আপনি তো এই ছায়ায় বসতে পারবেন না।

লোকটা অবাক হয়ে বলল, কেন নয়?

এই যে আমাদের সাথে কন্ট্রাক্ট সাইন করেছেন। এর সাত পৃষ্ঠার এগারো নম্বর লাইনে স্পষ্ট লেখা আছে, ভাড়াকারীকে শুধুমাত্র গাধাটি ভাড়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাকে গাধার ছায়া ভাড়া দেওয়া হয় নাই।

লোকটা মাথা চুলকে বলল, কিন্তু এই কড়া রোদ! একটু ছায়ায় বসতে চাইছিলাম—

কিন্তু আমরা তো বসতে দিতে পারি না। কন্ট্রাক্ট ভঙ্গ করা গুরুতর অপরাধ। আমাদের কোম্পানী এসব ব্যাপারে সাংঘাতিক কড়া।

লোকটা ইতস্ততঃ করে বলল, কিন্তু—

এজেন্সীর মানুষটি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, আপনি সত্যিই যদি গাধার ছায়ায় বসতে চান তার একটা উপায় আছে।

কি উপায়?

আলাদা করে ছায়াটা ভাড়া নিতে পারেন। এই যে আমার কাছে কাগজপত্র আছে, পড়ে দেখেন। যদি নিয়ম কানুনে আপত্তি না থাকে এই কাগজপত্রে সাইন করে টাকা পয়সা মিটিয়ে দিয়ে ছায়াটা ভাড়া নিতে পারবেন। আজকাল ছায়া আমরা স্পেশাল রেটে দিচ্ছি।

লোকটা গরমে একেবারে ঘেমে যাচ্ছিল কাজেই বেশী উচ্চবাচ্য না করে কাগজপত্র সাইন করে দাম পরিশোধ করে দিয়ে গাধার ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে থাকে।

সন্ধ্যেবেলা লোকটা তার গন্তব্যস্থলে পৌঁচেছে। গাধার পিঠ থেকে মাল পত্র নামিয়ে সে গাধা ফেরৎ দিতে গিয়েছে। গাধা ভাড়া নেওয়ার জন্যে আলাদা কাউন্টার, সুন্দরী একটা মেয়ে একটা কম্পিউটার স্ক্রীনের সামনে বসে আছে। লোকটা মেয়েটাকে গাধার দড়ি ধরিয়ে দিল, মেয়েটা কাগজপত্র সাইন করিয়ে নিতে নিতে হঠাৎ কম্পিউটারের স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি গাধা ফেরৎ দিচ্ছেন কিন্তু ছায়াটা কোথায়?

ছায়া?

হ্যাঁ। এই যে কম্পিউটারে স্পষ্ট লেখা আছে আপনি গাধা এবং গাধার ছায়া ভাড়া করেছেন।

এখন সন্ধ্যেবেলা, সূর্য ডুবে গেছে, ছায়া পাব কোথায়?

মেয়েটা বলল, এরকম কৈফিয়ত দিয়ে তো কোন লাভ নেই। এই যে কাগজপত্রেও স্পষ্ট দেখানো আছে আপনি গাধা এবং তার ছায়া ভাড়া করেছেন। গাধা ফেরৎ দিয়েছেন কিন্তু ছায়া তো দিলেন না—

লোকটা একটু রেগে গিয়ে বলল, আপনি কি ফাজলেমী করছেন?

মেয়েটা বাধা দিয়ে বলল, আপনি আমার কে? আপনার সাথে কেন আমি ফাজলেমী করতে যাব? আর আমাদের এটা হচ্ছে মালটিন্যাশনাল কোম্পানী। এর হেড অফিস নিউ ইয়র্কে। ব্রাঞ্চ অফিস ফ্রাংকফুর্ট হংকং আর সিংগাপুরে। আমরা বাংলাদেশের সোল এজেন্ট। আমাদের কোম্পানী প্রতিদিন কম করে হলেও তিন চার লাখ গাধা ভাড়া দেয়। এই গাধার বিজনেস করতে হয় কেমন করে সেটা আমাদের থেকে ভাল আর কেউ জানে না। যদি জিনিস ভাড়া দিয়ে ফেরৎ না দেন আপনি আমাদের এটর্নীর নোটিশ পাবেন। আর যদি কোন অভিযোগ থাকে, ঐ যে অভিযোগ বাক্স আছে লিখিতভাবে জানান।

লোকটি তখন আরো রেগে গেল। প্রায় মেয়েটির চুল ধরে ফেলছিল তখন হঠাৎ করে বিশাল তাগড়া দুইজন সিকিউরিটি অফিসার এসে তার দুই হাত ধরে ফেলে তাকে প্রায় চ্যাংদোলা করে বাইরে নিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার জন্যে পুলিশে দিয়ে দিল।

দুর্বচন: মালটিন্যাশনাল কোম্পানী দেশের সরকার থেকেও বেশী শক্তিশালী হতে পারে।

সনাতন রূপ: একটা কুকুর মুখে এক টুকরা গোশত নিয়ে একটা সেতু পার হচ্ছিল হঠাৎ সে নীচে তাকিয়ে পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। সে ভাবল সেটা আরেকটা কুকুর মুখে আরেক টুকরা গোশত নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরটা প্রতিবিম্বের মুখ থেকে গোশটা কেড়ে নেবার জন্যে ঘেউ ঘেউ করতে করতে পানিতে ঝাপিয়ে পড়ল। তার প্রতিবিম্বকে তো স্পর্শ করতে পারলই না, বরং নিজের মুখের টুকরোটিও হারাল!

সুবচন: অতি লোভ ভাল নয়।

আধুনিক রূপ: একটা কুকুর মুখে এক টুকরা গোশত নিয়ে একটা সেতু পার হচ্ছিল। সেতুর নীচে পানি। কুকুর হঠাৎ নীচে তাকিয়ে পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। কুকুরটি অবাক হয়ে দেখল প্রতিবিম্বটি নিখুত এবং একেবারে সত্যি বলে মনে হয়।

কুকুরটি সেতুর উপরে দাড়িয়ে মুগ্ধ বিষ্ময়ে নীচে পানির দিকে তাকিয়ে রইল। নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কুকুরের একটা বিচিত্র জিনিষ মনে হল এমন কি হতে পারে যে তার এই প্রতিবিম্বটিই সত্যি এবং সেই মিথ্যা! এমন কি হতে পারে যে আসলে সেই অন্য কুকুরটির প্রতিবিম্ব এবং যেই মুহূর্তে অন্য কুকুরটি সেতু পার হয়ে চলে যাবে সেই মুহূর্তে সে এবং তার চারপাশের সব কিছু অদৃশ্য হয়ে যাবে?

কথাটি ভাবতে ভাবতে কুকুরের মন উদাস হয়ে যায়, তার ভিতরে এক ধরণের শূণ্যতার জন্ম নেয়। সে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলার জন্যে মুখ খুলতেই মুখ থেকে গোশতের টুকরাটি নীচে পানিতে পড়ে যায়।

দুর্বচন: যাদের ভিতর যখন তখন গভীর ভাবের উদয় হয় তাদের খাবারের কষ্ট হয়।

সনাতন রূপ: দুইটি ব্যঙ একটা ডোবায় থাকত। এক গ্রীষ্মে সেই ডোবা শুকিয়ে গেল। ব্যঙ দুটি তখন বাধ্য হয়ে থাকার জন্যে অন্য জায়গা খুঁজতে শুরু করে। অনেক খোঁজা খুজি করে তারা একটা গভীর কূয়ার সন্ধান পেল। একনজর ভিতরে উঁকি দিয়ে খুশী হয়ে বলল, নীচে চমৎকার পানি! এখানেই থাকা যাবে।

অন্য ব্যঙটি একটু বুদ্ধিমান, সে বলল, আগেই এখানে থাকার জন্যে এত অস্থির হয়ো না। একবার ভেবে দেখ, যদি এটা শুকিয়ে যায় তাহলে বের হবে কেমন করে?

সুবচন: ভেবে কাজ কর, করে ভেবো না।

আধুনিক রূপ: স্বামী স্ত্রী দুটি ব্যঙ পদ্মার কাছাকাছি থাকত। ফারাক্কা বাধ দিয়ে বিশাল এলাকা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, ব্যঙেরাও পড়েছে মহা বিপদে। তাদের থাকার কোন জায়গা নেই, তাই প্রত্যেকদিন খবরের কাগজ কিনে বাসা ভাড়ার বিজ্ঞাপন পড়তে শুরু করল। কোন জায়গাই কিন্তু তাদের পছন্দ হয় না, অনেক খোঁজাখুজি করে একটা বিজ্ঞাপন তাদের মোটামুটি পছন্দ হল। টেলিফোনে বাসার মালিকের সাথে কথা বলে তারা একদিন গেল বাসা দেখতে।

বাসাটি চমৎকার। একটা গভীর কূয়া, উঁকি দিয়ে দেখে নীচে পানি টলটল করছে, ঠাণ্ডা স্যাঁতস্যাঁতে শীতল একটা পরিবেশ দেখেই চোখ জুড়িয়ে যায়। স্বামী ব্যঙ তো বলেই ফেলল, আহা, কি চমৎকার!

বাসার মালিক মাথা নেড়ে মলল, চমৎকার না হয়ে উপায় আছে? কত যত্ন করে এই বাসা তৈরী করেছি জানেন? আর্কিটেক্টকেই দিয়েছি দুই লাখ টাকা। ভিতরে ইটালিয়ান মার্বেল। আগাগোড়া মোজাইক, বাথরুমে টাইল, বিদেশী ফিটিং কোথাও কোন ফাঁকি ঝুকি নেই।

স্বামী ব্যঙ উৎসাহে স্ত্রীকে বলল, নিয়ে নেই বাসাটা, কি বল?

স্ত্রী মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, আগেই এত ব্যস্ত হয়ো না—পুরোটা ভেবে দেখ! যদি এই কূঁয়োটা শুকিয়ে যায়, তখন আমরা বের হব কেমন করে?

বাসার মালিক কথাটা শুনে ফেলল, সে হো হো করে হেসে বলল, আরে আপনাদের ভাবনা চিন্তা তো দেখি মান্ধাতা আমলের। এটা বিংশ শতাব্দী—এখন কি আর কূঁয়া থেকে লাফিয়ে বের হতে হয়? এখানে বের হওয়ার জন্যে রয়েছে লিফট! বোতাম টিপে দেবেন আপনাদের উপরে তুলে আনবে! লোড শেডিং নিয়ে ভাবছেন? পুরো বাসার জন্যে আছে আলাদা জেনারেটর—

স্ত্রী ভয়ে ভয়ে, বলল, বাসার ভাড়া কত?

বাসার মালিক বলল, সেটা হচ্ছে কথা। দুই বছরের এডভান্স দিতে হবে লীজ সাইন করতে হবে আরো এক বছরের প্রথম কিস্তিতে দেবেন তিন লাখ পরের কিস্তি দুই মাস পরে।

ভাড়ার কথা শুনে স্বামী ব্যঙের দাঁত কপাটি লেগে গেল সাথে সাথে!

দুর্বচন: মনোমত বাসা ভাড়া পাওয়া একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার।

এক চক্ষু হরিণ

সনাতন রূপ: একটা হরিণের এক চোখ ছিল অন্ধ, সেটা সমুদ্রের কাছে একটা বনের ধারে চড়ে বেড়াত। যেহেতু তার এক চোখ নষ্ট ছিল সে তার ভাল চোখটি রাখত বনের দিকে, বন থেকে কোন বিপদ এলে যেন সেটা দেখতে পারে। তার নষ্ট চোখটি ছিল সমুদ্রের দিকে কারণ সেদিকে দিয়ে তার বিপদের কোন আশংকা ছিল না।

একদিন সমুদ্র দিয়ে নৌকো করে যাচ্ছিল কিছু শিকারী। তারা সমুদ্রতীরে হরিণটা দেখে তীর ছুড়ে হরিণটাকে আঘাত করল।

যন্ত্রণায় ছটফট করে মারা যেতে যেতে এক চক্ষু হরিণ কাতর গলায় বলল, হায়, যে পথ দিয়ে বিপদ আসবে না ভেবে আমি চোখ সরিয়ে রেখেছিলাম, বিপদটা এল সেই পথ দিয়েই।

সুবচন: যে পথকে অবহেলা করা হয় বিপদ আসে সেই পথ দিয়েই।

আধুনিক রূপ: একটা হরিণ পুলিশে চাকুরী করত, তার এক চোখ ছিল নষ্ট। দুষ্টু লোকেরা তাকে কানা হরিণ বলে ডাকত। একদিন ইলেকশান হচ্ছে এক কলেজে, সেখানে গোলমাল হবার আশংকা তাই পুলিশ ডাকা হয়েছে। কানা হরিণ সেখানে গিয়েছে ডিউটি করতে।

যে দল ইলেকশানে হেরে যাবে বলে সন্দেহ করছিল তারা চাইনীজ কুড়াল আর কিরিচি নিয়ে হাজির হল। তারা যখন সেই সব ধারালো অস্ত্র হাতে নিয়ে হৈ হৈ করে আসতে শুরু করেছে কানা হরিণ তাড়াতাড়ি তার নষ্ট চোখটি সেদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে ভাল চোখটি রাখল অন্যদিকে। সন্ত্রাসী ছেলেগুলি তখন চাইনীজ কুড়াল আর কিরিচি দিয়ে কুপিয়ে বিপক্ষ দলের দুইজনকে ফালা ফালা করে কেটে সরে পড়ল। কানা হরিণ একেবারে কাছে বসে থেকেও কিছু দেখল না।

ইলেকশান ভন্ডুল হয়ে মহা হৈ চৈ হল কয়েকদিন। সন্ত্রাসী দল খুব খুশী, কানা হরিণ তার নষ্ট চোখ তাদের দিকে দিয়ে রেখেছিল বলে তারা সবচেয়ে খুশী হল তার উপর। পার্টিতে খবর পাঠালো তারা আর মোটা অংকের টাকা চলে এল কানা হরিণের জন্যে! কানা হরিণের বড় আনন্দ হল দেখে।

দুর্বচন: ব্যক্তিগত ঘুষ থেকে দলীয় ঘুষে টাকা অনেক বেশী।

সনাতন রূপ: এক শেয়াল একদিন এক কূয়াঁয় পড়ে গিয়ে কিছুতেই বের হতে পারে না, এরকম সময়ে একটা তৃষ্ণার্ত ছাগল এল কূয়াঁর কাছে। ভেতরে শেয়ালকে দেখতে পেয়ে ছাগল জানতে চাইল ভিতরে পানিটা কেমন?

শেয়াল বলল, খাসা পানি। জন্মে এরকম খাই নি, নেমে দেখ।

ছাগল সাথে সাথে লাফিয়ে ভিতরে নামল। যখন পানি খাওয়া শেষ হল তখন সে বাইরে বের হবার পথ খুঁজতে থাকে। শেয়াল বলল, এক কাজ করা যাক, তুমি তোমার পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাড়াও, আমি তারপর তোমার মাথায় ভর দিয়ে বাইরে বের হয়ে যাব। আমি বের হয়েই তোমাকে টেনে বের করে ফেলব।

শেয়ালের কথামত ছাগল ঠিক সেভাবে দাড়াল আর শেয়াল তার মাথায় ভর দিয়ে লাফিয়ে বাইরে এসে নিজের পথে রওনা দিয়ে দেয়। ছাগল তখন চিৎকার করে শেয়ালকে তার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দেয়, শুনে শেয়াল বলল, তোমার যদি একটুও বিবেচনা থাকত তাহলে এখান থেকে বের হবার রাস্তা আছে কি না, না দেখে তুমি কখনোই নীচে নামতে না।

সুবচন: দুষ্ট লোকের ছলের অভাব নেই।

আধুনিক রূপ: এক শেয়াল একদিন এক কূয়াঁয় পড়ে গিয়ে কিছুতেই আর বের হতে পারে না। ঠিক এরকম সময় একটা তৃষ্ণার্ত ছাগল এল কূয়াঁর কাছে। ভেতরে শেয়ালকে দেখতে পেয়ে ছাগল জিজ্ঞেস করল, শেয়াল, ভিতরের পানিটা কেমন?

শেয়াল বলল, ফাস কেলাশ ! একেবারে এক নম্বর পানি। যেরকম ঠান্ডা ঠিক সেরকম পরিষ্কার। একেবারে মিনারেল ওয়াটারের মত, একবার খেলে আর ভুলবে না।

সত্যি?

আমার কথা বিশ্বাস না হয় নীচে নেমে এসে দেখ!

শেয়ালের কথা শুনে ছাগল লাফিয়ে নামল কূয়াঁর ভিতরে। এক ঢোক খেয়ে দেখে পানিটা আসলে আহামরি কিছু নয়। ঘোলা এবং কেমন জানি এক ধরনের আঁশটে গন্ধ। তবে খুব তৃষ্ণা পেয়েছিল বলে ঢক ঢক করে বেশ খানিকটা পানি

খেয়ে নিল। পানি খেয়ে ছাগল উপরের দিকে তাকিয়ে বলল, এখন বের হব কেমন করে ?

শেয়াল মাথা চুলকে বলল, আসলে বের হওয়ার কোন উপায় নেই।

ছাগল চোখ কপালে তুলে বলল, তাহলে আমাকে নামতে বললে কেন?

শেয়াল আমতা আমতা করে বলল, কাজটা ঠিক হয় নাই।

ছাগল খুব রেগে গিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, শেয়াল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, তবে একটা কাজ করা যায়। তুমি যদি তোমার দুই পায়ের উপর ভর দিয়ে দাড়াও—আমি তাহলে তোমার উপর দিয়ে মইয়ের মত হেটে লাফিয়ে বাইরে বের হয়ে যেতে পারি। বাইরে বের হয়েই তোমাকে তখন টেনে তুলে ফেলব—একেবারে পানির মত সোজা ব্যাপারটা।

ছাগল চোখ লাল করে শেয়ালের দিকে তাকিয়ে বলল, বেজন্মা কোথাকার! তুই ভেবেছিস, আমি তোর মতলব বুঝি নি? আমাকে ফন্দী করে ভিতরে এনেছিস আমার ঘাড়ে চেপে বের হওয়ার জন্যে? আমাকে তুই এত বড় বোকা পেয়েছিস? আমি যদি তোকে আজ জন্মের মত একটা শিক্ষা না দেই!

এই বলে ছাগল তার শিং দিয়ে গুতো দিয়ে শেয়ালের বারটা বাজিয়ে দিল।

দুর্বচন: দুষ্ট বুদ্ধি মাঝে মাঝে উল্টো ফল দেয়।

সনাতন রূপ: এক জ্যোতির্বিদ প্রতিরাতে বাইরে বের হয়ে আকাশের তারা দেখত। একদিন যখন সে আকাশের তারা দেখতে দেখতে হাটছিল তখন হঠাৎ একটা কূয়াঁর মাঝে পড়ে গেল।

জ্যোতির্বিদ যখন কূয়াঁর মাঝে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে তখন একজন কাছে এসে বলল, তুমি যদি হাঁটার সময় সমস্ত মনোযোগ আকাশের দিকে দিয়ে রাখ, কোনদিকে যাচ্ছ সেটা পর্যন্ত খেয়াল কর না, তাহলে তো তোমার উচিত শিক্ষাই হয়েছে।

সুবচন: আকাশের নক্ষত্র দেখার আগে মাটির পৃথিবীকে দেখতে হয়।

আধুনিক রূপ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ বিভাগের একজন নামকরা প্রফেসর আকাশের গ্রহ নক্ষত্র দেখতে খুব ভালবাসেন। তার বাসায় ছয় ইঞ্চি একটা টেলিস্কোপ আছে, যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে তখন সেই টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা আকাশের গ্রহ নক্ষত্র দেখতে থাকেন। শুধু তাই নয়, এমনিতেও রাতের বেলা যখন হাঁটেন, তিনি আকাশের নক্ষত্র দেখতে দেখতে যান।

একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। তিনি যখন বাসায় ফিরছেন তখন বাইরে ঝিরঝিরে সুন্দর বাতাস। তিনি হেঁটে হেঁটে ফিরে আসতে আসতে আকাশের দিকে তাকালেন। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ, ঐ যে উত্তরে ধ্রুবতারা, তার পাশে সপ্তর্ষী মন্ডল। আরো উপরে স্বাতী নক্ষত্র। উত্তর পূর্ব দিকে ক্যাসিওপিয়া আর এন্ড্রোমিডা নক্ষত্র পুঞ্জ। জ্যোতির্বিদ প্রফেসর মুগ্ধ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে হাটছিলেন, প্রকৃতির কি অপরূপ বিস্ময়, কি অপূর্ব সৌন্দর্য্য!

ভাবতে ভাবতে তিনি সামনে পা রেখে হঠাৎ অনুভব করলেন তার পায়ের নীচে কিছু নেই। কিছু বোঝার আগেই তিনি একটা ম্যানহোলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বৃদ্ধ প্রফেসারের ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগল। তিনি পাঁকের মাঝে গড়াগড়ি খেয়ে সোজা হয়ে দাড়িয়ে ভাঙ্গা গলায় চিৎকার করতে লাগলেন। তার চিৎকার শুনে একটা রিক্সাওয়ালা রিক্সা থামিয়ে ম্যানহোলে উঁকি দিয়ে বলল, হইছেটা কি?

পড়ে গেছি ভাই! আকাশের দিকে তাকিয়ে হাটছিলাম, খোলা ম্যানহোলে পড়ে গেছি।

রিক্সাওয়ালা পিচিক করে থুতু ফেলে বলল, হালায় আসমানের দিকে তাকাইয়া হাটবার লাগবেন তয় কি গাতার মাঝে না পইড়া সরবতের মাঝে পড়বেন?

দুর্বচন: ঢাকার রিক্সাওয়ালারা খুব রসিক প্রকৃতির হয়ে থাকে।

গাধা এবং সিংহের চামড়া

সনাতন রূপ: একটা গাধা সিংহের একটা চামড়া পেয়ে সেটা গায়ে দিয়ে ভান করতে লাগল যে সে পশুরাজ সিংহ। বনে যত বোকা পশু পাখী ছিল সবাইকে সে ভয় দেখিয়ে বেড়াতে লাগল।

কিছুদিনের মাঝে তার সাথে একটা শেয়ালের দেখা হল, সে শেয়ালকেও ভয় দেখাতে চেষ্টা করল। শেয়াল কিন্তু ভয় পেল না, বলল, যখন শুনি একটা সিংহ গর্জন করছে তখন আমার সত্যি ভয় করে। কিন্তু যখন দেখি একটা পশু দেখতে সিংহের মত কিন্তু ডাকছে গাধার মত তখন বুঝতে বাকী থাকে না যে সে আসলে গাধা!

সুবচন: পরিচ্ছদ মানুষের পরিচয় নয়।

আধুনিক রূপ: একটা গাধা একবার বেশ কম দামে একটা সিংহের চামড়া পেয়ে গেল, চোরাচালানীর দল সেটা বাইরে থেকে এনেছে। চামড়াটা চমৎকার, দক্ষ কোন কারিগর নিশ্চয়ই সেটাকে সময় লাগিয়ে সেটা তৈরী করেছে। গাধা সিংহের চামড়াটা গায়ে দিয়ে বেড়াতে বের হল, তাকে দেখাতে লাগল সিংহের মত এবং সবাই তখন তাকে খাতির যত্ন করতে শুরু করে। রাস্তায় পশু পাখী তাকে দেখে মাথা নীচু করে সালাম দিল, রেষ্টুরেন্টে যেতেই যত পশুপাখী ছিল সবাই দাড়িয়ে গেল। রাস্তায় দাড়িয়ে রিক্সার জন্যে হাত তুলতেই এক সাথে চারটা রিক্সা দাড়িয়ে গেল, শুধু তাই নয় রিক্সা করে কোথাও যাবার পর রিক্সা ভাড়া দিতে চাইলে রিক্সাওয়ালা হাত জোড় করে বলল, ছিঃ ছিঃ স্যার, আপনার কাছ থেকে ভাড়া কিভাবে নিই? নিউ মার্কেটে গিয়ে একটা শার্ট কেনার পর দাম দিতে গেলে দোকানী হাত জোড় করে বলে, লজ্জা দেবেন না স্যার, আপনি এসেছেন দোকানে, এতেই আমাদের জীবন ধন্য!

এই ভাবে বেশ সময় কেটে যাচ্ছে, গাধা সিংহের চামড়া পরে ঘুরে বেড়িয়ে পশু পাখীর খাতির যত্নে মোটামুটি অভ্যস্তই হয়ে গেল। একদিন হঠাৎ তার শেয়ালের সাথে দেখা। শেয়াল বিশেষ ধুরন্ধর প্রকৃতির, পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে কাজ করে। গাধাকে দেখে অন্য দশ জনের মত সে লাফিয়ে উঠে সালাম করল না। গাধা ভিতরে ভিতরে চটে উঠে জিজ্ঞেস করল, কি হে শেয়াল, আমাকে চিনতে পারছ না?

শেয়াল বলল, অবশ্য চিনতে পারছি স্যার, আপনি গাধা।

গাধা চমকে উঠে বলল, বুঝলে কেমন করে?

বোঝা আর কঠিন কি? গলার স্বরেই তো বোঝা যায়। কোথায় সিংহের গর্জন আর কোথায় গাধার ডাক। যে কেউ বুঝতে পারে।

গাধা বুঝল সে ধরা পড়ে গেছে। তখন হা হা করে হেসে বলল, কেমন একটা রসিকতা করলাম! আমরা গাধারা খুব রসপ্রিয় প্রাণী।

শেয়াল বলল, তাই তো দেখছি। তবে দেখতে হবে রস করার সময় কোন আইন ভেঙ্গেছে কি না।

গাধা মাথা নেড়ে বলল, উহুঁ! কোন আইন ভাঙ্গি নি। আমি আইন কলেজে দুই বছর পড়েছি এসব জিনিষ আমার নখের ডগায়। রসিকতা করলে আইন ভঙ্গ হয় না।

লোকজনকে ঠকিয়েছেন, পয়সা কড়ি হাতিয়েছেন।

কাউকে ইচ্ছে করে ঠকাই নি। কারো কাছে নিজে থেকে কিছু দাবী করি নি। সবাই নিজে থেকে দিয়েছে।

শেয়াল বলল, কিন্তু এই যে সিংহের চামড়াটা সেটা কোথায় পেয়েছেন?

কিনেছি।

বৈধ ভাবে কিনেছেন? ক্যাশ মেমো আছে?

গাধা মাথা চুলকে বলল, না, মানে ইয়ে—

শেয়াল শক্ত মুখ করে বলল, আপনি জানেন বন্য পশু সংরক্ষন আইন বলে একটা আইন আছে? সেই আইনে বাঘ সিং হরিণের চামড়া বেচা কেনা পুরোপুরি নিষিদ্ধ? কাউকে যদি এদের চামড়া সহ পাওয়া যায় সাথে সাথে তাকে এরেষ্ট করার কথা—

গাধা আমতা আমতা করে কি একটা বলতে যাচ্ছিল শেয়াল তার আগেই পকেট থেকে হাত কড়া বের করে গাধার দুই পায়ে হাত কড়া লাগিয়ে দিল।

দুর্বচন: বন্য পশু সংরক্ষন আইন কঠিন আইন।

সনাতন রূপ: একজন কৃপন মানুষ তার সমস্ত সোনা গলিয়ে বড় একটা সোনার তাল তৈরী করে মাঠে একটা গর্তের মাঝে লুকিয়ে রেখেছিল। প্রত্যেকদিন মাঠে গিয়ে সে সোনার তালটা বের করে সেটার দিকে লোভীর মত তাকিয়ে থাকত।

আর একজন মানুষ একদিন কৃপন মানুষটার পিছু পিছু গিয়ে ব্যাপারটা দেখে ফেলল। তারপর রাতে এসে সে সোনার তালটা চুরি করে পালিয়ে গেল।

পরের দিন কৃপন মানুষটা মাঠে গিয়ে দেখে তার সোনার তালটা চুরি হয়ে গেছে, সে তখন চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। তার একজন পড়শী ব্যাপারটা জানতে পেরে বলল, বন্ধু, তুমি কেন ব্যাপারটা নিয়ে এত ভেঙ্গে পড়েছ? একটা ইট নিয়ে গর্তে রেখে দাও, প্রত্যেকদিন গিয়ে সেটাই দেখ, সোনার তালটা তো তোমার কোন কাজে আসছিল না, এখন সেখানে সোনাই রাখ আর ইটই রাখ দুটির মাঝে কোন তো পার্থক্য নেই।

সুবচন: অব্যাহৃত সম্পদ অর্থহীন।

আধুনিক রূপ: মীরপুরের এগারো নম্বর সেকশানে একজন নামকরা কৃপন মানুষ থাকত। দুষ্টু লোকেরা বলাবলি করত সে এত কৃপন ছিল যে চিনির কৌটা থেকে ধরে ধরে পিপড়াগুলি চায়ের কাপে ফেলত, সেগুলি যেটুকু চিনি খেয়েছে সেটা বের করে আনার জন্যে। সারা জীবন সে কোন পয়সা খরচ করে নি তাই শেষ জীবনে দেখা গেল তার অনেক টাকা পয়সা হয়েছে। তার সব টাকা পয়সা সে বিছানার নীচে লুকিয়ে রাখত। রাত গভীর হলে সে দরজা জানালা বন্ধ করে তার টাকাগুলি গুনতে বসত। কত টাকা আছে সেগুলি গোনাই ছিল তার জীবনের একমাত্র আনন্দ।

মীরপুর এলাকায় তখন খুব চোরের উপদ্রব। কৃপন মানুষটার স্ত্রী বলল, হ্যাঁ গো, তুমি তো যক্ষের মত টাকাগুলি আটকে রেখেছ, এখন যখন একদিন চুরি হয়ে যাবে তখন বুঝবে মজা।

কৃপন মানুষটা শিউরে উঠে বলল, ছিঃ ছিঃ ছিঃ ওমন কথা মুখে এনো না।

মানুষজন টাকা পয়সা দিয়ে কত কি করে, শাড়ী গয়না কেনে। দেশ বিদেশে বেড়াতে যায়। ভাল মন্দ খায়, তুমি তো কিছুই করলে না।

কৃপন মানুষ চোখ কপালে তুলে বলল, কি সব বলছ তুমি? এই ভাবে টাকার অপচয় করব? তোমার মাথা খারাপ হয়েছে?

স্ত্রী বলল, অন্ততঃ টাকাটা তো ব্যাঙ্কে তো রাখতে পার। তুমি মরলে পরে সেই টাকাটা আমরা ভোগ করতে পারব। এখন যদি চোর ডাকাত এসে টাকার লোভে তোমাকে খুন করে যায় তাহলে তো আমও যাবে ছালাও যাবে!

টাকাটা ব্যাঙ্কে রেখে দিলে রাত্রিবেলা আর সে তার টাকা হাত বুলিয়ে দেখতে পারবে না, কিন্তু স্ত্রীর যন্ত্রণায় শেষ পর্যন্ত কুলির মাথায় করে বস্তা বস্তা টাকা নিয়ে বি.সি.সি.আই. ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে এল।

কৃপন মানুষ এখন রাত গভীর হলে তার পাশ বুকটা খুলে খুলে দেখে। সংখ্যাগুলির মাঝে হাত বুলায় তারপর পাশ বুকটা বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে থাকে।

এর মাঝে একদিন বি.সি.সি.আই. ব্যাঙ্ক ফেল করল, দেশ জুড়ে হৈ চৈ। মানুষজন ছুটে গেল ব্যাঙ্কে, কৃপন মানুষও গিয়েছে। ব্যাঙ্কে গিয়ে খবর পেল তার সব টাকা মার গিয়েছে। সে মাথায় হাত গিয়ে হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাসায় ফিরে এল। কৃপনের স্ত্রী মুখ ঝামটা দিয়ে বলল, উচিৎ শিক্ষা হয়েছে এখন ! ঢং দেখে মরে যাই—তোমার পাশ বুক তো আর চুরি হয় নি। ঘুমাবার সময় সেটা বুকে চেপে ঘুমাবে এখনো—পার্থক্যটা কি হয়েছে?

দুর্বচন: স্ত্রীদের টাকা পয়সা খরচ করতে দিতে হয়।

সনাতন রূপ: একটা কাকড়া একদিন সমুদ্রে তার বাসস্থান ছেড়ে হেঁটে হেঁটে সমুদ্র তীরের বনাঞ্চলে হাজির হল। জায়গাটি খুব সুন্দর, নানা রকম গাছ আর ফুল, পাখীর ডাক দেখে শুনে কাকড়ার খুব পছন্দ হল সে ঠিক করল এখন থেকে সে এখানেই থাকবে।

একদিন একটা ক্ষুধার্ত্ত শেয়াল এসে তাকে কামড়ে ধরল। ঠিক তাকে খেয়ে ফেলার আগে কাকড়াটা কাতর গলায় বলল, হায়, কেন আমি সমুদ্রে আমার নিজ বাসভূমি ছেড়ে এই বনে চলে এলাম? দেশত্যাগ করার প্রতিফল এখন দিতে হচ্ছে আমার নিজের প্রাণ দিয়ে!

সুবচন: নিজের যেটুকু আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

আধুনিক রূপ: কাকড়া একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। যেটুকু বেতন পায় সেটা দিয়ে কোনমতে তার সংসার চলে যায়। এর মাঝে হঠাৎ নিউ ইয়র্ক থেকে একটা ওয়ার্কশপে অংশ নেয়ার জন্যে তার কাছে একটা চিঠি এল। কাকড়া মহা খুশী, জীবনের প্রথম দেশের বাইরে যাবে, তার নানারকম প্রস্তুতি। পাশপোর্ট ভিসা করে সদরঘাট থেকে একটা পুরানো কোট কিনে একদিন সে প্লেনে চেপে বসল।

প্লেন নিউইয়র্কে পৌছাল দুপুর বেলা। ইমিগ্রেশান, কাষ্টমস শেষ করে বাইরে এসে কাকড়া একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল, এত সুন্দর একটি দেশ! উঁচু চকচকে দালান, বড় বড় রাস্তায় গাড়ী যাচ্ছে, মানুষেরা সুন্দর কাপড় পরে মিষ্টি করে কথা বলছে। শহরে এসে দেখে সুন্দর সুন্দর দোকানপাট, আলোকোজ্জ্বল আনন্দময় পরিবেশ। কাকড়া মুগ্ধ হয়ে বলল, আমাকে এই দেশেই থাকতে হবে, যেভাবেই হোক!

দুই সপ্তাহের ওয়ার্কশপ শেষে যখন কাকড়ার দেশে ফিরে যাবার সময় হল কাকড়া দেশে ফিরে না গিয়ে নিউইয়র্কেই রয়ে গেল। কাগজপত্র ঠিক নেই, তবু সে পরিচিত কয়েকজনকে ধরাধরি করে একটা রেষ্টুরেন্টে কাজ জুটিয়ে নিল, রাত্রিবেলা রেষ্টুরেন্টের বাসন ধোয়া। প্রথম প্রথম কষ্ট হত, বিশেষ করে স্ত্রী আর ছোট ছোট দুজন বাচ্চার কথা মনে পড়ে বুক খা খা করত, কিন্তু কিছুদিনেই বেশ অভ্যাস হয়ে গেল। মনে হতে লাগল এই তো চমৎকার একটা জীবন।

একদিন বিকাল বেলা কাকড়া হাঁটতে বের হয়েছে। ম্যানহাটানে ব্রডওয়ে ধরে হেঁটে আসছে হঠাৎ ছয়ফুট লম্বা একটা শেয়াল তার সামনে এসে দাড়াল। কিছু বোঝার আগেই বুকের কলার চেপে ধরে বলল, কি আছে বের কর।

কাকড়া ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার মানি ব্যাগ বের করে দিল। শেয়াল মানি ব্যাগ খুলে দেখে মাত্র কুড়ি ডলার। হুংকার দিয়ে বলল, মাত্র কুড়ি ডলার? তোর সাহস তো কম না মাত্র কুড়ি ডলার নিয়ে রাস্তায় বের হোস! জানিস না এক ছিলিম ক্র্যাক কিনতেই ত্রিশ ডলার লেগে যায়?

কাকড়া কিছু বলার আগেই শেয়াল ছয় ইঞ্চি লম্বা একটা চাকু বের করে কাকড়ার পেটে বসিয়ে দিল।

রক্তাক্ত কাকড়াকে যখন এম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিল, ডাক্তার শুনতে পেল কাকড়া বিড় বিড় করে বলছে, নিজের দেশ ছেড়ে এসেছি বলে আজ আমার এই অবস্থা। এই প্রতিফল!

দুর্বচন; পকেটে কম পয়সা নিয়ে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় বের হওয়া ঠিক নয়।

সনাতন রূপ: মৃত্যুপথযাত্রী একজন চাষী তার ছেলেদের ডেকে বলল, আমি কিছুক্ষনের মাঝেই মারা যাব। মৃত্যুর আগে তোমাদের আমি একটা কথা বলে যেতে চাই। আমার যে আঙুর বাগান আছে সেখানে আমি তোমাদের জন্যে একটা গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছি, তোমরা সেটা খুড়ে বের করে নিও।

চাষী মারা যাবার সাথে সাথে ছেলেরা খন্তা কোদাল নিয়ে খুড়োখুড়ি শুরু করে দিল। সমস্ত আঙুর ক্ষেত ওলট পালট করেও তারা কোন গুপ্তধন খুঁজে পেল না। কিন্তু আঙুর ক্ষেত এত ভালভাবে চষা হয়ে গেল যে সে বছর আঙুরের অবিশ্বাস্য ফলন হয়ে ছেলেগুলির অর্থকষ্ট দূর হয়ে গেল।

সুবচন: মাটিতেই সোনা ফলে।

আধুনিক রূপ: নার্সিংহোমে মৃত্যুপথযাত্রী এক চাষী তার ছেলেদের ডেকে বলল, আমার সময় শেষ, মৃত্যুর আগে তোদের একটা কথা বলে যেতে চাই।

ছেলেরা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ওরকম করে বল না বাবা।

বাবা ধমক দিয়ে বলল, গাধার মত কান্নাকাটি করবি না। কি বলছি মন দিয়ে শোন।

ছেলেরা চোখ মুছে বলল, বল বাবা।

সাভারে আমাদের কয় বিঘা জমিতে আঙুর ক্ষেত আছে না?

জী বাবা।

সেখানে আমি তোদের জন্যে একটা গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছি।

সত্যি? ছেলেদের চোখ লোভে চক চক করে উঠে, সত্যি বলছ?

সত্যি বলছি।

কোথায় লুকিয়েছ বাবা?

সেটা বলব না।

বলবে না? ছেলেরা চিৎকার করে বলল, তাহলে বের করব কেমন করে?

খুঁড়ে বের করে নে।

কোথায় খুঁড়ব?

বাবা বলল, সেটা বলব না।

বলবে না মানে? বড় ছেলে রেগে উঠে বাবাকে ধরে একটা ঝাকুনী দিল। ঝাকুনী খেয়েই কি না কে জানে বাবা তখন তখনই মারা গেল।

বাবাকে কোনমতে আজিমপুরে কবর দিয়ে এসেই ছেলেরা গুপ্তধনের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে বসল। বড় ছেলে বলল, আমার ভাগটা দিয়ে আমি বারিধারায় একটা বাড়ী করব।

মেজো ছেলে বলল, আমি ওসবের মাঝে নেই। গুলশানে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে নেব, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন।

ছোট ছেলে বলল, তোমরা থাক এদেশে। আমি এম্বেসীতে তিন লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে ভিসা বের করে সোজা আমেরিকায়।

বড় ছেলে বলল, কিন্তু সবার আগে তো গুপ্তধনটা বের করতে হবে।

তা ঠিক।

একটা ট্রাক্টর এনে পুরো জায়গাটা খুড়ে ফেললে হয়।

মেজো ছেলে পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র, সে হেসে বলল, আরে না, ওসব ঝামেলায় যেয়ো না। ভাল দেখে একটা মেটাল ডিটেক্টর কিনে এনো। তারপর ক্ষেতের উপর দিয়ে সেটা নিয়ে হেঁটে যাবে। ঠিক যেখানে বাবা গুপ্তধন পুঁতে রেখেছে সেখানে গেলেই মেটাল ডিটেক্টর শব্দ করে উঠবে।

অন্য দুই ভাই খুশীতে মাথা নাড়ল। মেঝো ভাইয়ের বুদ্ধির ওপরে তাদের গভীর বিশ্বাস।

তিন ভাই তখন তাদের অন্য যেসব সহায় সম্পত্তি ছিল সবকিছু বিক্রি করে সিংগাপুর থেকে একটা খুব দামী মেটাল ডিটেক্টর কিনে আনল, কাষ্টমসে সেটা নিয়ে কিছু যন্ত্রণা হওয়ায় অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে সেটা ছুটিয়ে আনতে হল। কয়দিনের মাঝেই বাবার গুপ্তধন থেকে অনেক টাকা আসবে চিন্তা করে তারা সেটা নিয়ে বেশী দুশ্চিন্তা করল না।

প্রথমেই তারা সাভারের আঙুর ক্ষেতের সব গাছ কেটে সাফ করে নিল তারপর মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তন্ন তন্ন করে গুপ্তধন খোঁজা শুরু করল।

এভাবে বছর দুয়েক কেটে যায়। গুপ্তধন তারা আর খুঁজে পায় না, আঙুরের আবাদও বন্ধ। জমি বিক্রি করে করে একসময় তারা সর্বসান্ত হয়ে যায়। এখন তারা গুলিস্তানের সামনে দাদ ও খুজলির মলম বিক্রি করে। যখন সময় পায় তখন আজিমপুরে গিয়ে বাবার কবরের পাশে দাড়িয়ে বাবাকে গালি গালাজ করে।

দুর্বচন: চিহ্নিত কবর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

সনাতন রূপ: একটা জেলে একদিন সমুদ্রে জাল ফেলেছে, জাল টেনে তুলে দেখে সেখানে ছোট একটা মাছ। মাছটি কাকুতি মিনতি করে বলল, আমি ছোট একটা মাছ, আমাকে ধরে কি করবে? আমাকে ছেড়ে দাও, যখন আমি বড় হব, তখন যদি আমাকে ধর আমি তোমার অনেক বেশী কাজে আসব।

জেলে বলল তুমি যেটুকু আছ সেটাই আমার জন্যে যথেষ্ট। এখন যদি আমি তোমাকে ছেড়ে দিই আবার কোনদিন তোমাকেই ধরতে পারব বলে মনে হয় না।

সুবচন: নগদ দশ টাকা বাকী একশ টাকা থেকে ভাল।

আধুনিক রূপ: সিলেট শহরের কাছাকাছি হঠাৎ পাহাড় থেকে পানির ঢল নেমে এসে বন্যা শুরু হয়েছে। নূতন পানিতে মাছ লাফ ঝাপ দিচ্ছে দেখে গ্রামের একজন তার জাল নিয়ে বের হল মাছ ধরতে। জাল ফেলতেই ছোট একটা মাছ ধরা পড়ল। মাছটি টুকরীতে রাখতে যাচ্ছিল তখন সেটি কাকুতি মিনতি করে বলল, ভাই জেলে, তুমি আমাকে কেন ধরেছ?

জেলে বলল, ধরব না কেন? মাছ না ধরলে মাছ খাব কেমন করে?

কিন্তু আমি এইটুকু মাছ, আমাকে দিয়ে কি হবে? আমাকে ছেড়ে দাও যখন অনেক বড় হব তখন যদি আমাকে ধর একটা কাজের কাজ হবে।

জেলে ধমক দিয়ে বলল, বাজে বক বক করিস না! তুই হচ্ছিস পুটি মাছ। পুটি মাছ রুই মাছের মত বড় হয় না, এইটুকুই থাকে। তুই আবার বড় হবি কি করে?

দুর্বচন: যারা ছোট হয়ে জন্মায় তাদের কপালে অনেক দুঃখ।

সনাতন রূপ: পথের ধারে পড়েছিল এক সাপ, শীতে জমে হিম হয়ে আছে। একজন দয়ালু কৃষক সাপটাকে দেখে কাপড়ে জড়িয়ে কোলে তুলে নিল। সাপটা উষ্ণতায় প্রাণ ফিরে পেয়েই ছোবল দিল কৃষককে। যন্ত্রণায় ছটফট করে মারা গেল দয়ালু কৃষক।

সুবচন: দুষ্টলোকের উপকার করতে নেই।

আধুনিক রূপ: বাহাত্তর সালে পথের ধারে আটকা পড়েছিল এক সাপ। ভয়ে আতংকে জমে হিম হয়ে আছে। একজনের মায়া হল সাপটাকে দেখে, তাকে তুলে মুক্ত করে দিল, মুক্তি পেয়েই সে ছোবল দিল লোকটাকে লোকটা যন্ত্রণায় ছট ফট করতে করতে বলল, কে? তুমি কে?

আমি স্বাধীনতা বিরোধী, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী, ধর্মোন্মাদ, দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক রাজাকার আল বদরের দল। তুমি কে?

আমি? আমি বাংলাদেশ।

দুর্বচন: বিনা বিচারে অপরাধীদের মুক্তি দিতে নেই।

সনাতন রূপ: বাঘের গলায় হাড় ফুটেছে মাংস খেতে গিয়ে—অনেক কষ্ট বাঘের, কিছুতেই হাড় বের করতে পারে না। এমন সময় তার দেখা হল একটা সারস পাখীর সাথে, বাঘ সারসকে বলল, তুমি আমার গলা থেকে হাড় বের করে দাও, আমি তোমাকে অনেক পুরস্কার দেব। সারস বাঘের গলায় মাথা ঢুকিয়ে হাড় বের করে দিয়ে বলল, দাও পুরস্কার। বাঘ গর্জন করে বলল, আমার মুখের ভিতর মাথা ঢুকিয়ে যে জ্যান্ত বের হয়ে এসেছিস, সেটাই তোর পুরস্কার।

সুবচন: মন্দ লোকের উপকার করে প্রতিদান আশা করতে নেই।

আধুনিক রূপ: বাঘের গলায় হাড় ফুটেছে মাংস খেতে গিয়ে, অনেক কষ্ট বাঘের, কিছুতেই হাড় বের করতে পারে না। বাঘ গেল সারস পাখীর কাছে, বলল, তুমি আমার গলা থেকে হাড় বের করে দেবে?

সারস বলল, আজ তো শুক্রবার। শুক্রবার আমি রোগী দেখি না। তুমি আগামী কাল আস।

কিন্তু অনেক যন্ত্রণা—সহ্য তো করতে পারি না।

যন্ত্রণা তো হবেই, ইনফেকশান হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। দুইটা প্যারাসিটামল খেয়ে শুয়ে থাক গিয়ে।

পরদিন বাঘ এল সারস পাখীর কাছে। সারস বলল, তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। যারা আগে এসেছে তাদের না দেখে তো তোমাকে দেখতে পারি না।

বাঘ সারাদিন অপেক্ষা করে বসে রইল। বিকেল বেলা সারস ডাকল বাঘকে। বলল, আমার ভিজিট কত জান তো?

জানি।

ভিজিটের টাকা এনেছো তো?

এনেছি।

দাও।

বাঘ সারসকে ভিজিটের টাকা, দেওয়ার পর সারস বাঘের মুখে মাথা ঢুকিয়ে হাড় বের করে এনে বলল, মস্ত বড় হাড়। খারাপ ভাবে লেগেছিল। ইনফেকশান হয়ে গেছে ভিতরে।

বাঘ ভয়ে ভয়ে বলল, তা হলে উপায়?

এন্টিবায়োটিক্সের প্রেসকৃপশান লিখে দিচ্ছি, আমার দোকান থেকে কিনে নিও।

জী আচ্ছা।

আর শোন, এর পর থেকে বোকার মত মাংস থেকে হাড় আলাদা না করে মাংস খেয়ো না কোনদিন। মনে থাকবে তো?

মনে থাকবে।

বাঘ অত্যন্ত বিনীত ভাবে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

দুর্বচন: ডাক্তারদের খুব তোয়াজ করে চলতে হয়।

সনাতন রূপ: একটা ছোট পুকুরে অনেকগুলি ব্যাঙ। পুকুর পারে খেলছিল অনেকগুলি ছেলে। তারা ঢিল ছুড়ে মারছিল ব্যাঙগুলির দিকে—ঢিলের আঘাতে মারা পড়ছিল অসংখ্য ব্যাঙ। একটা ব্যাঙ তখন সাহস করে একটা পদ্মফুলের মাথায় দাড়িয়ে বলল, বন্ধ কর তোমাদের এই খেলা। তোমাদের কাছে যেটা খেলা আমাদের কাছে সেটা মৃত্যু।

সুবচন: দুর্বলদের অবহেলা করতে হয় না।

আধুনিক রূপ: নীলগঞ্জ হাই স্কুলের ক্লাশ সিক্স সেকশান বি.এর ছাত্রেরা ফুটবল খেলে বাসায় ফিরে যাবার সময় একটা ডোবার সামনে দাড়িয়ে ঢিল মেরে কিছু ব্যাঙের বারটা বাজিয়ে দিল। তখন একটা ব্যাঙ সাহস করে একটা পদ্মফুলের উপরে দাড়িয়ে বলল,বন্ধ কর তোমাদের এই খেলা। তোমাদের কাছে যেটা খেলা আমাদের কাছে সেটা মৃত্যু!

ছেলেগুলি ঢিল ছোড়া বন্ধ করল সাথে সাথে। একজন বলল, শুনলি কি বলল?

হ্যাঁ, কথা বলল ব্যাঙটা।

একেবারে মানুষের মতন।

তার মানে এই ব্যাঙগুলি কথা বলতে পারে!

একটা যদি ধরতে পারি হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারব!

হাজার কি বলছিস? লাখ টাকায় বিক্রি হবে! কথা বলা ব্যাঙ।

সাথে সাথে ছেলের দল ঝাপিয়ে পড়ল ডোবার মাঝে সব ব্যাঙকে ধরে নিয়ে গেল সাথে করে।

দুর্বচন: ব্যাঙ হয়ে মানুষের গলায় কথা বলা নেহায়েৎ বেকুবের মত কাজ।

সনাতন রূপ: একজন রাখাল বালক মাঠে গরু চরাতো। ভীষণ দুষ্টু ছিল সে— একদিন সে চিৎকার করে বলতে লাগল বাঁচাও বাঁচাও বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে। গ্রামের সব মানুষ লাঠি গোটা নিয়ে ছুটে গিয়ে দেখল কোন বাঘ নেই রাখাল বালক মজা করার জন্যে বলেছে। কয়দিন পর আবার সেই একই ব্যাপার গ্রামের লোকজন আবার ছুটে গিয়ে দেখে এবারেও কোন বাঘ নেই। এরকম কয়েকবার হল তারপর হঠাৎ একদিন সত্যি সত্যি বাঘ এসে হাজির। রাখাল বালক প্রাণ ভয়ে চিৎকার করতে লাগল, বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে বাঁচাও বাঁচাও। গ্রামের সবাই ভাবল সে মজা করার জন্যে বলছে কেউ তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না। বাঘ এসে রাখাল বালকের ঘাড় মটকে খেয়ে ফেলল।

সুবচন: মিথ্যাচার করলে তার প্রতিফল পেতে হয়।

আধুনিক রূপ: একজন রাখাল বালক মাঠে গরু চরাতো। সে ছিল ফাঁকী বাজ এবং দুষ্টু! অন্যের ক্ষেতে গরু ছেড়ে দিয়ে সে বাজারে চায়ের দোকানে বসে হিন্দী গান শুনতে শুনতে আড্ডা মারত। একদিন মজা করার জন্যে সে মাঠে গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগল, বাঘ এসেছে বাঘ এসেছে বাঁচাও।

গ্রামের লোকেরা সেটা শুনে একজন আরেকজনকে বলল, শুনো ছেলেটা বলেছে বাঘ এসেছে।

গ্রামের চেয়ারম্যান বললেন, বাঘ কোত্থেকে আসবে? আশে পাশে কি জংগলের নিশানা আছে যে বাঘ আসবে? সব জংগল কেটে পরিষ্কার করে ফেলেছে না?

সবাই বলল, তা ঠিক তা ঠিক।

তখন সবাই আবার শুনল ছেলেটা তখনো চিৎকার করে বলছে, বাঁচাও বাঁচাও বাঘ এসেছে, বাঘ।

তখন একজন বলল, এত যখন চিৎকার করছে তখন গিয়ে দেখা উচিৎ না?

বেশ কয়েকজন তখন যেতে রাজী হল। একটা দোনালা বন্দুক এবং কিছু কার্তুজ নিয়ে চেয়ারম্যানের পিছু পিছু সবাই মাঠে গেল, পথে কাদায় পিছলে গিয়ে চেয়ারম্যানের নূতন প্যান্ট কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মাঠে গিয়ে দেখে রাখাল বালক গাছের নীচে বসে সিগারেট টানছে। একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, কি রে বাঘ কোথায়?

রাখাল বালক চোখ টিপে বলল, বাঘ নাই, ঠাট্টা করে বলেছি।

চেয়ারম্যান হুংকার দিয়ে বললেন, হারামজাদা, আমার সাথে ঠাট্টা?

গ্রামের মানুষেরা তখন তাকে ধরে এমন পেটানী দিল যে তার সামনের দুটি দাঁত ভেঙ্গে গেল।

রাখাল বালক এর পর থেকে জন্মের মত সিধে হয়ে গিয়েছিল আর কখনো কাউকে জ্বালাতন করে নি।

দুর্বচন: যাদের সেন্স অফ হিউমার নেই তাদের সাথে মশকরা করতে হয় না।

হাঁসের সোনার ডিম

সনাতন রূপ: একজন লোকের ছিল একটা হাঁস, সেই হাঁস প্রতিদিন একটা করে সোনার ডিম পাড়তো। লোকটা ভাবল প্রত্যেকদিন মাত্র একটা করে সোনার ডিম পাওয়ার চাইতে সবগুলি একবারে পেয়ে গেলে ভাল হয়। লোকটা তাই হাঁসটিকে মেরে তার পেট চিড়ে ফেলল একদিন। দেখল ভিতরে কোন ডিম নেই, মাথায় হাত দিয়ে হায় হায় করতে লাগল তখন।

সুবচন: অতি লোভে সর্বনাশ হয়।

আধুনিক রূপ: একজন লোকের ছিল একটা হাঁস প্রতিদিন সেই হাঁস আধ কে.জি. ওজনের একটা করে সোনার ডিম পাড়তো। একটা গার্মেন্টি ইন্ডাষ্ট্রী দেয়ার জন্যে লোকটার একবার একসাথে অনেক ক্যাশ টাকার প্রয়োজন হল। সে ঠিক করল হাঁসটা মেরে তার পেট কেটে একসাথে সবগুলি সোনার ডিম বের করে ক্যাশ টাকা জোগাড় করবে। তার স্ত্রী শুনে বলল, ব্যাটা ছেলেদের বুদ্ধিই এইরকম। হাঁস মেরে পেট কেটে যদি দেখা যায় ভিতরে কোন ডিম নেই তখন?

লোকটি বলল, তা ঠিকই বলেছ। কিন্তু এখন কি করা যায় বল তো?

স্ত্রী বলল, এক্স-রে ক্লিনিক নিয়ে হাঁসটাকে এক্স-রে করে দেখ পেটে কয়টা ডিম। যদি দেখ অনেকগুলি আছে কেটে বের করা যাবে।

লোকটি হাঁসটাকে এক্স-রে ক্লিনিকে নিয়ে এক্স-রে করে দেখল পেটে কোন সোনার ডিম নেই। কাজেই লোকটা হাঁসের পেট কাটল না, দিনে একটা করে সোনার ডিম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল।

তবে শহরে জানা জানি হয়ে যাওয়ায় কিছুদিনের মাঝেই সে বড় ধরনের ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলায় পড়ে গেল।

দুর্বচন: ইনকাম ট্যাক্স অফিসের লোকজনের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কাক ও শেয়াল

সনাতন রূপ: একদিন একটা কাক এক টুকরা মাংস মুখে নিয়ে গাছে বসেছে। নীচে দিয়ে একটা শেয়াল যাচ্ছিল কাকের মুখে মাংস দেখে তার ভারী লোভ হল। সে গাছের নীচে বসে বলল, কি সুন্দর এই পাখী। যেমন তার গায়ের রং তেমন তার গঠন। আহা এই পাখীর গলার স্বরও নিশ্চয়ই কত মধুর! একটি বার যদি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেতাম!

কাক শেয়ালকে তার গলার স্বর শোনানোর জন্যে যেই কা কা করে ডাকল, তার মুখের মাংস পড়ে গেল নীচে। শেয়াল সেই মাংস নিয়ে পালিয়ে গেল সাথে সাথে।

সুবচন: চাটুকারীতার উদ্দেশ্য কখনো ভাল নয়।

আধুনিক রূপ: একদিন একটা কাক বিয়েবাড়ী থেকে একটা কাবাব চুরি করে এনে একটা গাছে বসেছে, ঠিক তখন একটা শেয়াল নীচে দিয়ে যাচ্ছে। কাবাব দেখে তার খুব লোভ হল। সে গাছের নীচে বসে কাকের দিকে তাকিয়ে বলল, কি সুন্দর এই পাখী! যেরকম তার গায়ের রং সেই রকম ফিগার, শরীরে এতটুকু বাড়তি ফ্যাট নাই। ভাব ভঙ্গী কত স্মার্ট, নিশ্চয়ই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করে এসেছে। চোখ গুলি কত সুন্দর একেবারে অতলান্তিক সমুদ্রের গভীরতা। কি অপূর্ব! আহা—এর গলার স্বরও নিশ্চয়ই কত সুন্দর! এই পাখীর গলায় একবার যদি একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পারতাম জীবন ধন্য হয়ে যেতো—

কাক সব শুনে মনে মনে বলল ব্যাটা ধরিবাজ, মনে করিস আমি তোর মতলব বুঝি না? তোর নজর তো এই কাবাবের উপর, দাড়া তোকে দেখাচ্ছি মজা! তোকে শুনাই আমার গলার স্বর—

কাক তখন ঠোটের এক পাশ দিয়ে শক্ত করে কাবাবটা ধরে রেখে অন্য পাশ দিয়ে বিকট স্বরে বলল,

কা কা কা
খা আমার বিষ্ঠা খা!

তারপর সে হতচকিত শিয়ালের মাথায় বাথরুম করে দিল।

দুর্বচন: কখনো পাখী জাতীয় প্রাণীর নীচে দাড়ানো ঠিক নয়।

* * *